কৃষণ চন্দর

ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ

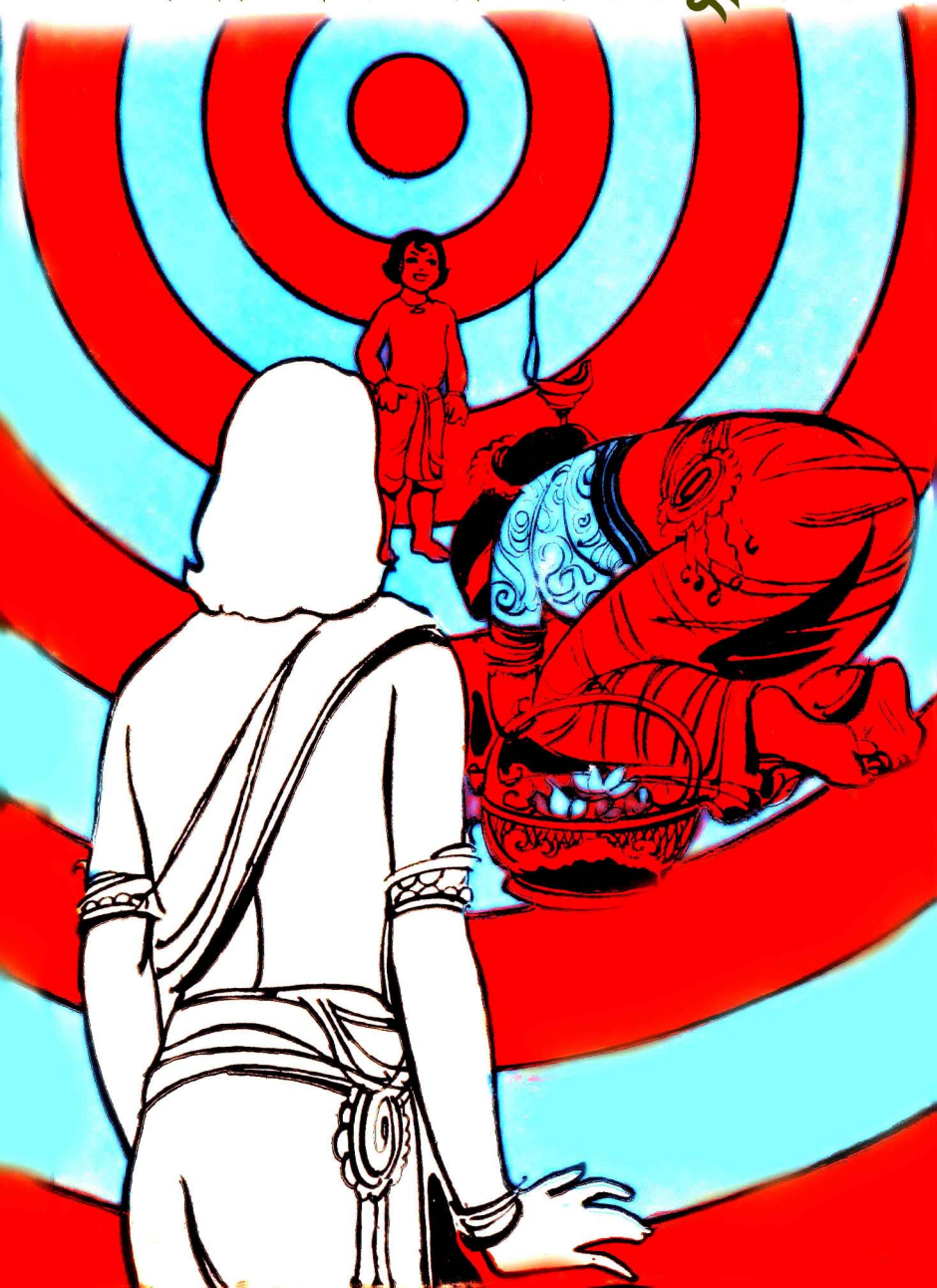

মূল

কৃষণ চন্দর

ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

বইটি সাবধানতা এবং যত্নতার সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

মোস্তফা হারুণ

অনূদিতঅনূদিতঅনূদিতঅনূদিতঅনূদিতঅনূদিতঅনূদিতঅনূদিতঅনূদিত

প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ়, ১৩৮৫

মূল্য : ৮·০০

প্রকাশনায় :
দেওয়ান আবদুল কাদের ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণে :
আবুল হাশেম ॥ সোসাইটি প্রিণ্টার্স ॥ ৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা
শিল্পী :
প্রাণেশ কুমার মণ্ডল
জুন : ১৯৭৮

আদমজী ও বাংলা একাডেমী
পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি
আবদুস সাত্তার
করকমলে

মনের মতো কয়েকটি অনুবাদগ্রন্থ

●

ডার্লিং ডার্লিং ডার্লিং
দু'টি উদাস চোখ
চাঁদ, হে চাঁদ
ফুলে ফুলে খুঁজে ফেরে
ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ
এবং আলো এবং আঁধার
রক্তের মত লাল
প্রেমেশ্বরী
নির্মলা
মাটির প্রেম
এজেণ্ট এফ. বি. আই.
বাবু গোপীনাথ
হংকং-এ একরাত
নির্বাচিত আরবী গল্প
লাভ স্টোরি
পাঁচ গুণ্ডা এক নায়িকা
সুন্দর পৃথিবী
মাণ্টোর অপ্রকাশিত গল্প
দু'ফোঁটা পানি
স্বর্গের শেষ ধাপ
গুলশান গুলশান

●

আমার কথা

প্রায় বছর দশেক আগে এই উপন্যাসের মূল বইটি আমি ফুটপাথে পেয়েছিলাম। 'দাদর পুলকে বাচ্চে' নামক এই উপন্যাসটির বিষয়-বস্তু আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল, তখন থেকেই ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম 'ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ' নাম দিয়ে বইটি অনুবাদ করব। কিন্তু দীর্ঘদিন নানা ব্যস্ততার দরুন তা' আর অনুবাদ করতে পারিনি। দেশ স্বাধীন হবার পর দৈনিক 'আজাদে' বসে বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধু ফকির আশরাফের সাথে লেখাটির বিষয়-বস্তু নিয়ে আলাপ হলে তিনি বেশ উৎসাহ প্রদর্শন করেন এবং তাড়াতাড়ি তা অনুবাদ করে আজাদের সাহিত্য পাতায় দেবার অনুরোধ করেন। বলা বাহুল্য, তিনি তখন পত্রিকাটির সাহিত্য সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। এ জন্যে তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আজাদের সাহিত্য পাতায় ছাপা হওয়ার পর লেখার কোন কপি রাখতে পারিনি।

পুস্তকাকারে ছাপার জন্য শেষ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার থেকে অনুজ প্রতিম রুহুল আমিন দৌলতী বহু শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে লেখাটি কপি করে আমাকে দেয়। তার এই সহযোগিতা ছাড়া বইটির প্রকাশ হয়ত সম্ভব হ'ত না। বিশিষ্ট লেখক ও প্রকাশক জনাব মোস্তাফা কামাল বইটি প্রকাশ করে আমার সুপ্ত ইচ্ছাকে রূপ দিয়েছেন। তার সদিচ্ছার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকল।

অনুবাদের উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্পর্কে সহৃদয় পাঠকরা যদি আমাকে তাদের মতামত জানান, তাহলে আগামী সংস্করণে আরো নির্ভুল ও সুন্দরভাবে উপন্যাসটি প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

—মোস্তফা হারুন

আমার বন্ধু কৃষণ চন্দর

কৃষণ চন্দর আমার বন্ধু, আমার সহগামী—এই টেকোটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারি না (অবশ্য আমি তার চেয়েও বেশী টেকো)।

যখন তার সাথে আমার আদৌ পরিচয় হয়নি, তার নামটা শুনেই আমার গা জ্বালা করে উঠত। কারণ, যেখানেই তার নাম ছাপা হতো, নামের সাথে ডিগ্রীর লেজুড়টাও বেমালুম জুড়ে দেয়া হতো, কৃষণ চন্দর এম. এ.—ছিঃ, এটা একটা কথা হলো? তুমি বাবা এম. এ. পাস করেছ (আমি মনে মনে বলি) তো আমি কি করব? আমার কি আসে যায় তাতে? কালীদাস তো কোনদিন বিদ্যালংকারের লেজুড়টা তাঁর নামের সাথে জুড়ে দেননি। মির্জা গালিব কি আলেম ফাজেল পাস ছিলেন? শেক্সপীয়ার বেচারী তো ম্যাট্রিক পাসও ছিলেন না। কেউ যদি বলেন 'আর্মস এ্যাণ্ড দি ম্যান' নাটকটি রচনা করেছেন 'বার্নার্ড শ' বি. এ.—তাহলে লোকেরা হাসবে না? এখন চিন্তা করুন, কৃষণ চন্দর এম. এ.-টা কেমন ঠেকছে।

অবশেষে এই হতভাগার সাথে একদিন দিল্লীর পুরনো রেডিও ষ্টেশনে দেখা হয়ে গেল আমার। দেখে মনে হলো আর যা হোক, হতভাগার চেহারাটা কিন্তু মন্দ না। অবশ্য ইতিপূর্বেও আমি কৃষণ চন্দরের ছবি পত্র-পত্রিকায় দেখেছিলাম। বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল, কোঁকড়ানো চুল। কোট-প্যাণ্ট-টাই মিলিয়ে বেশ স্মার্ট দেখাচ্ছিল। এজন্যেই তো কলেজের মেয়েরা তার রোমান্টিক গল্প পড়ার জন্যে পাগল। আমি মনে মনে বললাম।

আবার মনে মনে বললাম, আসলে ছাপানো ছবিটা ফটোগ্রাফাররা রিটাচ করে নিয়েছিল হয়ত, যাতে রোমান্টিক গল্প লিখিয়ের চেহারাটাও রোমান্টিক হবে, আসলে যা কোনদিন হয় না।

কিন্তু তার সাথে দেখা করে আমার সে ভুল ভাঙল। আমার মেজাজটা

এবারে আরো বিগড়ে গেল তার ওপরে। মনে মনে বললাম, হায় খোদা, একটি লোকের চেহারা যেমন রোমান্টিক, তেমনি তার লেখাতেও পর্যাপ্ত যাদু রয়েছে, যা পড়ে (পাঠকের পরিবর্তে পাঠিকারাই বেশী) তার প্রেমে পড়ে যায়—এই কি তোমার ইনসাফ ?

সেকালে কাশ্মীরী বাজারের একটি ছোট বাংলো হতে দিল্লী রেডিওর অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছিল তখন। বলতে গেলে দিল্লী রেডিও একটা সাহিত্য মজলিশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। কৃষণ চন্দর, সাদত হাসান মাণ্টো, উপেন্দ্রনাথ আশক্—এরা তিনজনই তখন কাজ করতো সেখানে। 'মেজাজ' রেডিওর উর্দু ম্যাগাজিন 'আওয়াজে'র সম্পাদক ছিলেন। ফয়েজ আহমদ ফয়েজ ও চেরাগ হাসান হাসরতকে তখন সেখানে প্রায়ই সৈনিকের পোশাকে বসে থাকতে দেখা যেতো। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝে নিয়েছিলাম, এদের সবারই মধ্যমণি হলেন কৃষণ চন্দর এম. এ.। মনে হলো কৃষণ চন্দর নিজেই নিজের রোমান্টিক গল্পগুলোর নায়ক। হাত মেলাবার ফাঁকে আমি তার উচ্চতাটাও দেখে নিলাম। আমার মতোই মাঝারি ধরনের লম্বা। রাহুল সংকৃতায়ন বা মতলবী ফরিদাবাদীর ন্যায় দানব প্রকৃতির নয়।

কৃষণ চন্দরের সাথে আমার দেখা হয়েছিল সে আজ পঁচিশ বছরের কথা। কৃষণ চন্দরের শিরদেশের সেই কোঁকড়ানো কেশরাজি আজ নিশ্চিহ্ন। মোটা লেন্সের পুরু চশমার কাচের আড়ালের বুদ্ধিদীপ্ত সেই বড় বড় চোখজোড়া পঞ্চাশ বছর যাবৎ জীবনের নানা উত্থান-পতন ও আলো-ছায়ার লুকোচুরি দেখে দেখে আজ ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। পরিশ্রম, চিন্তা-ভাবনা এবং দুঃখ-বেদনার ছায়া এসে তাঁর সেই কমনীয় রোমান্টিক মুখকে আচ্ছন্ন করেছে। বয়স এবং অভিজ্ঞতার রেখা ফুটে উঠেছে তার মুখাবয়বে। এতদিন পর আজও কৃষণ চন্দরের নাম শুনে আমার হিংসা হয়। পঞ্চাশোত্তর বয়সেও সে দিব্যি রোমান্টিক গল্পের ইন্দ্রজালে সবাইকে বিমুগ্ধ করছে। তার গল্প-উপন্যাসের বই পড়ে এখনো কলেজের ছাত্রীরা তাকে না দেখেই তার প্রেমে পড়ে যায়। এবং তা হিন্দুস্থানের বাইরেও।

আমি এবং সর্দার জাফরী তখন মস্কোতে ছিলাম। যেখান থেকে

কৃষণ চন্দরকে চিঠির ওপর চিঠি এবং টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তাকে মস্কো চলে আসতে বললাম। বললাম, তুমি চলে এসো এবং আমাদের বাঁচাও। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের এশীয় ভাষা সমূহের এক কলেজে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। উর্দু সাহিত্যের ব্যাপারে আমরা কিছু আলোকপাত করব, এই উদ্দেশ্য। মিলনায়তনে প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রী উন্মুখ হয়ে আমার বক্তৃতা শুনছিল। বক্তৃতা শেষ হতেই আমার প্রতি প্রশ্নের বারিবর্ষণ চলল। প্রশ্নকারীদের মধ্যে মেয়েরাই বেশী। এরা সবাই এখানে উর্দু অথবা হিন্দি পড়াশুনা করছে। এদের বেশীর ভাগ প্রশ্নই ছিল কৃষণ চন্দর সম্পর্কে। এরা সবাই নাকি কৃষণ চন্দরের বই পড়েছে। শুধু তাই নয়, কৃষণ চন্দরের গল্পের বহু সংলাপও তাদের কণ্ঠস্থ। বুঝতে পারলাম, হিন্দুস্থানের কথাশিল্পীদের মধ্যে তারা একমাত্র কৃষণ চন্দরেরই ভক্ত এবং তার সম্পর্কেই তাদের হাজার রকমের প্রশ্ন। তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসের নাম কি? তিনি আজকাল কি করছেন? তিনি কি বিয়ে করেছেন? তাঁর ছেলেমেয়ে ক'টা? ইত্যাকার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমরা হিমশিম খেয়ে উঠছিলাম।

এরপর এক পাঠাগার পরিদর্শন করতে গিয়ে জানলাম, যে ক'জন ভারতীয় লেখকের বই রুশ ভাষায় তর্জমা হয়েছে, তন্মধ্যে কৃষণ চন্দরের লেখাই বেশী আলোড়ন সৃষ্টিকারী। রিডিং-রুমে যেয়ে দেখলাম, একটি মেয়ে বসে বসে কৃষণ চন্দরের অনুবাদ পড়ছে। সর্দার জাফরী জিজ্ঞেস করল, কমরেড, আপনি কি এই লেখককে পছন্দ করেন? সম্ভবতঃ মেয়েটি কোন এক কারখানায় কাজ করে। জাফরীর প্রশ্ন শুনেই সে উল্লসিত হয়ে বলল, তা কি আর বলতে!

এরপর দেখা গেল, আরো যে ক'জন মেয়ে চুপচাপ বসে পড়ছিল, তারাও এসে জানালো কৃষণ চন্দর আমাদের প্রিয় লেখক!

সর্দার জাফরী এদেরকে উত্তেজিত করার জন্য বলল, কিন্তু আমরা তো কৃষণ চন্দরকে তেমন পছন্দ করি না। তার লেখায় তেমন কোন উচ্চাঙ্গের চিন্তাধারা নেই। তার সব লেখাই রোমান্টিক ধরনের।

মেয়েরা সমস্বরে বলল, 'এই জন্যই তো আমরা তাঁকে পছন্দ করি। তাঁর রোমান্টিক লেখায় সমাজের সত্যিকারের চিত্র পাওয়া যায়।' জাফরী আলোচনা বিলম্বিত করার জন্যে বলল, 'ফুল সুরখ্ হ্যায়' উপন্যাসে (এক অন্ধ ফুল বিক্রেতাকে কেন্দ্র করি রচিত) আমি তো মনে করি ভারতীয় মজুরদের সত্যিকার চিত্র ফুটে ওঠেনি।'

এ কথা বলতেই একজন মজুর শ্রেণীর লোক প্রতিবাদ করে বলল, 'কে বলে এতে মজুরদের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়নি? মজুরদের বাহ্যিক চিত্র এতে না ফুটে থাকলেও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অন্তর্জগতের সম্পূর্ণ আবেদন এতে ফুটে উঠেছে।'

এ কথার পর আর একটি মেয়ে এগিয়ে এসে কৃষণ চন্দরের অপর একটি উপন্যাসের নাম করল। উপন্যাসের নাম 'পুরে চান্দ কি রাত'। উপন্যাসটি সর্বতোভাবে রোমান্টিক। সমাজ চিত্র বা সামাজিক সমস্যার কোন কিছুই এতে আলোচিত হয়নি। এ উপন্যাস ছাপা হবার পর কৃষণ চন্দরকে ভারতীয় কাঠমোল্লা ধরনের কমরেডরা রোমান্টিক বুর্জোয়া বলে আখ্যায়িত করেছিল। মেয়েটি বলল, 'এমন সুন্দর কাহিনী আর হয় না। এই উপন্যাসে সমাজের সমুদয় সুষমা যেন নিংড়ে আনা হয়েছে। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মনের গভীর কন্দরে প্রেম ও আবেগ-আকুতির এমন সুন্দর চিত্র আঁকতে পারেন—এমন মরমী শিল্পী বিরল।

কৃষণ চন্দর জীবনকে ভালবাসেন বলে এমন কাহিনী লিখতে পেরেছেন। সৌন্দর্য এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যের এমন কাব্যময় প্রকাশ সচরাচর কোন গদ্য লিখিয়ের দ্বারা সম্ভব হয় না।—কৃষণ চন্দরের লেখা পড়ে মনে হয় তিনি একজন কবি। কিন্তু তাঁকে কেউ কবি বলে না।

শৈশবে কৃষণ চন্দর কিছুকাল কাশ্মীরে ছিলেন। কাশ্মীরের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক শোভা কৃষণ চন্দরের মনে কাব্যিক অনুভূতির জন্ম দিয়েছে। কাশ্মীরের পটভূমিকায় কৃষণ চন্দর বহু চমৎকার গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কাশ্মীর থেকে শুধু যে কাব্যিক উপাদান পেয়েছেন, তা নয়—কাশ্মীরের

সৌন্দর্য তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছে রোমান্টিক এবং সম্পূর্ণ অভিনব ষ্টাইলে তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন। শুধুমাত্র কাশ্মীরের সৌন্দর্যের ভিত্তিতেই যে কৃষণ চন্দরের মনে সাহিত্যের উন্মেষ ঘটেছে, তা নয়। একটি দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থ জীবনের তিতিক্ষা তাকে গাল্পিক হিসেবে গড়ে তুলেছে। ছোট-বেলার কয়েক মাস তিনি অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। কারাবাসের মত স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত তিনি তাঁর চেতনার সাথে সংগ্রাম করেছেন। 'ওরকান' গল্পে তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। না স্কুলে যেতে পারেন, না পারেন বন্ধুদের সাথে দেখা করতে। কতদিন হয়েছে তিনি বই-পুস্তক দেখেননি—এভাবে তিনি তাঁর রুগ্নজীবন-এর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন গল্পটিতে। এ সময় তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা চক্ষু মুদে নিজের সম্পর্কে, মা-বাবার সম্পর্কে, জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে, জানালার বাইরের কাশ্মীরের শ্যামল উপত্যকা সম্পর্কে, পাহাড়ের চড়াই-উৎরাইতে ভারী বোঝা নিয়ে যেসব নিম্নবিত্ত কাশ্মীরীদের কাফেলা চলেছে, তাদের সম্পর্কে এবং নিজের অসুস্থ জীবনের বিষিয়ে-ওঠা মন সম্পর্কে ভেবেছেন। তাঁর এই তিক্ত-বিষাক্ত মন সারা বিশ্বের সকল ব্যথা বেদনার সাথে যেন একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিল।

কৃষণ চন্দর অসংখ্য গল্প লিখেছেন। কাশ্মীরের মনোলোভা সুষমামণ্ডিত পটভূমিকা থেকে শুরু করে বোম্বাইয়া নোংরা অলিগলি এমন কি 'মহালক্ষী পুলের' পরিবেশকেও তিনি গল্পে চিত্রিত করেছেন। তিনি 'এক্সট্রা গার্ল'-এর কাহিনী লিখেছেন। কালুভাঙ্গীর কাহিনী ও বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ এবং পাঁচ টাকার স্বাধীনতার কাহিনীও তাঁর কলম থেকে বাদ যায়নি। মদমত্ত তীব্র যৌবনানুভূতির গল্প এবং 'লালবাগ'-এর মত গল্পও লিখেছেন তিনি, যেখানে মানুষ মানুষের রক্তপাত ঘটিয়েছে। 'পেশোয়ার এক্সপ্রেসের' মত ভয়ানক কাহিনীর পাশাপাশি 'পুরে চান্দ কি রাত'-এর প্রেমঘন রোমান্টিক কাহিনীও তিনি লিখেছেন। এভাবে সকল শ্রেণী ও সকল পরিবেশের গল্প লেখার পর তিনি 'কাহানী কি কাহানী' নামে গল্পের গল্পও রচনা করেছেন।

কৃষণ চন্দরের চিন্তাশক্তি এমন এক স্বয়ংক্রিয় মেশিন, যার কবলে সকল

অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ব্যথা-বেদনা এবং বন্ধু ও শত্রু বেমালুম কাহিনীর বিশেষ উপাদান হিসেবে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে।

কৃষণ চন্দর এত কাহিনী লিখেছেন, তাঁর কাহিনীটা কেউ লেখেননি। তবে এ কথা বলা যায়, কৃষণ চন্দরের সকল কাহিনী ভিন্ন অর্থে তাঁর নিজেরই কাহিনী। প্রত্যেক কাহিনীতে কৃষণ চন্দর নতুনভাবে জন্মলাভ করেছেন। প্রত্যেক কাহিনীতে তিনি জন্ম থেকে জন্মান্তরে বিচরণ করেছেন।

কৃষণ চন্দরের কাহিনী কেউ লেখেননি। তিনি নিজেও লেখেননি। তবে 'ইয়াদোঁকে চিনার' গল্পে তাঁর শৈশবকালের কিছু ঘটনা ব্যক্ত করেছিলেন। কৃষণ চন্দর নিজেই যদি তাঁর জীবনীটা লিখে যেতে পারতেন, তাহলে একটা মস্তবড় কীর্তি সম্পাদিত হ'ত।

আমি জানি, কৃষণ চন্দরের বয়স এখন পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। (আমাকে গালি না দিয়ে ছাড়বে না যে, কথাটা ফাঁস করে দিলে কেন তুমি?) এ যাবৎ তিনি ৩০টির কাছাকাছি বই লিখেছেন, গল্পও বোধ হয় শ'পাঁচেক লিখেছেন।

বন্ধুরা অভিযোগ করে বলে, কৃষণ বড় বেশী লেখে। আমিও মানি, কৃষণ চন্দরের মত এত বেশী পরিমাণে কেউ লেখে না। কিন্তু আমি তাঁর আর্থিক অসংগতির কথা জানি। নিজের এবং পরিবার পরিজনের অন্ন-সংস্থানের জন্যেই তাঁকে এত বেশী পরিমাণে লিখতে হয়। নামের জন্যে তিনি লেখেন না। পাক-ভারতে তাঁর মত খ্যাতি আর কোন লেখকের নেই। ফিল্ম-ষ্টারদের চাইতেও কৃষণ চন্দরের ভক্তদের চিঠির সংখ্যা অত্যধিক। তাঁর বই-এর উর্দু এবং হিন্দি সংস্করণ প্রতি বছরই ছাপা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে কৃষণ চন্দর যে শুধুমাত্র একজন খ্যাতনামা ভারতীয় কথাশিল্পী তা নয়, বরং তাঁর ব্যাপক সাহিত্য কর্মের ওপর পি. এইচ. ডি-র প্রবর্তন করা হয়েছে এখন সেখানে। ভারতের এমন কোন উর্দু বা হিন্দি পত্রিকা নেই যাতে কৃষণ চন্দরের লেখা না ছাপা হয়। কৃষণ চন্দরের লেখার জন্যে সকল পত্রিকা লালায়িত থাকে। এত কিছু সত্ত্বেও কৃষণ চন্দর একজন মহান সাহিত্যশিল্পী

হতে পারেননি। অন্ততঃ কৃষণ চন্দর নিজে তাই মনে করেন। এতটুকু দম্ভও নেই তাঁর অভিব্যক্তিতে। কৃষণ চন্দর নিজের গল্পগুলোকে নিজের সন্তানের মতো ভালবাসেন। অথচ কেউ কোনদিন তাঁর মুখে নিজের গল্পের সপক্ষে একটি কথাও শোনেনি। আসল কথা হলো, মনের মতো করে গল্প লেখা এখনও তাঁর হয়ে উঠেনি।

কৃষণ চন্দর আমার বন্ধু, আমার সহগামী। নেহাতই সাদাসিধে একজন মানুষ। জীবনে বহু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। সাংবাদিক ছিলেন, সম্পাদক ছিলেন, কলেজের ছাত্রদেরকে পর্যন্ত পড়িয়েছেন। রেডিওর চাকরী থেকে আরম্ভ করে চিত্রজগৎ পর্যন্ত এসে হানা দিয়েছেন। ডায়ালগ লিখেছেন, ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। অন্য প্রযোজকের জন্যে হিট কাহিনী লিখেছেন। বেকার এবং রিক্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। প্রেম ও বিয়ে থেকে আরম্ভ করে হৃদয়ের লেন-দেন এবং পরে বিচ্ছেদ পর্যন্ত বাদ দেননি। ঘর ভেঙ্গেছেন এবং আবার ঘর বেঁধেছেন। কখনো আন্দোলনকারীদের সাথে যোগ দিয়েছেন। কখনো বা মোশায়েরাতে বসে সময় নষ্ট করেছেন। কালক্রমে কংগ্রেস পার্টি করেছেন, আবার সুযোগ বুঝে সোস্যালিষ্ট কম্যুনিষ্টদের সাথেও হাত মিলিয়েছেন। কিন্তু আসলে তিনি কোন পার্টিতেই ছিলেন না। কর্ম গোত্র ইত্যাদি বন্ধনের অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। সাম্রাজ্যবাদ ও বিভেদ সৃষ্টির বড় শত্রু ছিলেন তিনি।

আমার এ বন্ধুটি লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী তিনি খরচ করেছেন। কোন সময়ই তাঁর ধার-কর্জ শেষ হতো না। বাড়ন্ত নাকের ডগায় তাঁর সর্দি সব সময় লেগেই থাকতো। কৃষণ চন্দরের চারপাশে সব সময় দু'ধরনের লোক থাকত। একদল পাওনাদার, অপর দল কর্জের উমেদার। নিজে ধার-কর্জ করলেও অপরকে আবার ধার-কর্জ দেবার বেলায় বেশ তৎপর ছিলেন। আপনার পকেটে পয়সা না থাকলে আপনি কৃষণ চন্দরের শরণাপন্ন হতে পারেন। সম্ভবতঃ নিরাশ হবেন না। সাদা শার্ট আর উলেন পাতলুন পরনে থাকে তাঁর। তাঁর পকেটে কোনদিনই দেড়-দু'টাকার বেশী থাকে না। কালেভদ্রে কখনো

বেশী পয়সা হলে ট্যাক্সি ভাড়া করে চারদিকে বেড়াতে শুরু করেন এবং বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে হানা দিয়ে তাদেরকে টাকা দিয়ে আসেন। শেষাবধি সন্ধ্যাবেলা তাঁর পকেটে বাসে চড়বার মতো ক'টা পয়সা থাকতো মাত্র।

হতে পারে তাঁর বাড়িতে চাল বাড়ন্ত। কিন্তু লিখতে বসলে তাঁর সামনে দামী মস্তবড় রাইটিং প্যাড থাকতেই হবে। আজেবাজে কাগজে তাঁর কলম চলতে নারাজ। ভাবসাব দেখে মনে হবে, নীল রং-এর পুরু কাগজে কোন যুবক তার প্রেমিকার কাছে প্রেমপত্র লিখতে বসেছে।

নিয়ম বা সময়ানুবর্তিতার দাস হয়ে কোন সময়ই তিনি কাজ করতে পারেননি। মুড ভাল থাকলে এক বসাতেই হয়ত পুরো উপন্যাস লিখে ফেলেন। আর ভাল না লাগলে দু'তিন মাসের মধ্যেও এক-আধ শব্দ লিখতে মন চায় না তাঁর। তাঁকে নিয়ে আপনি যে-কোন বিষয়ে গল্প জমাতে পারেন। রাজনীতি, সাহিত্য, সিনেমা, নাটক, রোমান্স, স্ক্যাণ্ডেল এবং এমন কি আজেবাজে ঘরোয়া গল্পও।

—খাজা আহমদ আব্বাস

উর্দু 'নক্‌শ'

জুলাই, ১৯৬৮ ইং

●

ভগবানের সাথে কিছুক্ষণ

এক

এক নাগাড়ে দু'দিন উপোস করে অনাহারক্লিষ্ট জীবনের প্রতি ভীষণ ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন খোলার ঘরে বসে পরনের ছেঁড়া লুঙ্গিটার আঁচলে কুড়িয়ে পাওয়া ক'টা যবের দানা রেখে চিবিয়ে খাচ্ছিলাম, ঠিক এমন সময় ভগবান আমার ঝুপড়ির মধ্যে ঢুকে বলল, 'বসে বসে কি করছ, চলো এই শহরের শিশুদের একবার দেখে আসি।'

আমি একটা বিরক্তিভাব প্রকাশ করে বললাম, 'যাও, যাও, আমার কাছে ওসব ফালতু টাইম নেই।'

ভগবান বলল, 'অত রাগছ কেন? চলো মোড়ের রেস্তোরাঁ থেকে দু'টো স্লাইস, একটা আমলেট এবং সিংগেল চা খাইয়ে দেবো তোমাকে।'

'সত্যি বলছ, না কোন এমনি চাপাবাজী করছ?'

আমি দু'টো অস্থির চোখ ভগবানের দিকে রেখে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

ভগবান পকেট থেকে কড়কড়ে দশ টাকার একটা নোট বের করে আমার লোভাতুর চোখের সামনে একবার আন্দোলিত করল।

আমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম, 'আগে থেকে কেন বলোনি তাহলে? আমার আবার টাইম টেবল আছে নাকি? দু'টো পয়সা খরচ করলে বোম্বেতে এমন কোন কাজ নেই যা হয় না।'

ইরানী রেস্তোরাঁতে ঢুকে আমি বেয়ারাকে বললাম, 'দেখো সাহেব কি চায়, তাকে দাও। কিন্তু আমাকে গোটা চারেক স্লাইস, দু'টো ডিমের আমলেট এবং একটা ডবল চা জলদি দাও।'

ভগবান প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'ডবল ডবল কেন? আমি তো শুধু ডবল স্লাইস, এক আমলেট, এক চার কথা বলেছিলাম।'

আমি বললাম, 'তুমি তো স্বর্গের রেস্তোরাঁর কথা মনে করে অর্ডার দিয়েছ। কিন্তু এটা স্বর্গ নয়, বোম্বাই। এখানকার ব্যাপার স্যাপারই অন্য রকম। সম্ভবতঃ বোম্বাইর স্লাইস তুমি কোনদিন দেখনি। এত মসৃণ এবং পাতলা যে, চোখের সামনে ধরলে এপার ওপার দেখা যায়। কিছু মাখন লাগিয়ে তুমি বরং তা দিয়ে দিব্যি শেভও করতে পার। আর ডিমের কথা বলছ? বোম্বের মুরগীগুলো এত ছোট ডিম দিয়ে থাকে যে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া পেয়ালায় ডিম খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। চায়ের কথা আর কি বলব, এখানকার চায়ের কাপগুলোতে যে পরিমাণ চা দেয়া হয়, এক ফোঁটা চোখের জলও এর চাইতে বেশী।'

কিন্তু ভগবান আমার কথায় সায় দিলো না। আমিও তার যুক্তি মানতে রাজী হলাম না। এ নিয়ে আমরা দশ মিনিট কথা কাটাকাটি করলাম। কিন্তু শেষাবধি রেস্তোরাঁর মালিক যখন পুলিশ তলব করার কথা বলল, তখন ভগবান চুপসে গেল এবং বাধ্য হয়ে আমার জন্যে চারটা স্লাইস, দুটো আমলেট ও ডবল চায়ের অর্ডার দিয়ে নিজের জন্যে একটা এসপ্রো আনিয়ে নিলো।

আমি বললাম, 'তুমি শুধু শুধু ঝগড়াটা করলে। আমার কথা যদি প্রথমেই মানতে, তাহলে এখন তোমাকে এসপ্রো খেতে হতো না।'

ভগবান লজ্জিত হয়ে বলল, 'ভাই আজকাল ফরেন এক্সচেঞ্জের বড় সংকট চলছে। স্বর্গ থেকে বোম্বেতে আসার জন্যে আমি মাত্র দুটো টাকার এক্সচেঞ্জ পেয়েছি। জানি না এখানে কদ্দিন থাকতে হয়। এজন্যে আমাকে প্রতিটি পাই হিসেব করে খরচ করতে হয়।'

আমি তেড়ে উঠে বললাম, 'গল্প করার আর জায়গা পাও না তুমি। তোমার আবার ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝামেলা কিসের? এসব ঝামেলা তো এই গরীবদের জন্যে। এই মর্তের মাটিতে একজন কারখানা মালিকের পক্ষে যেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ যোগাড় করতে বেগ পেতে হয় না, সেখানে সারা দুনিয়ার মতো বিরাট একটা কারখানার যে মালিক তার তো মোটেই বেগ পাবার কথা নয়।'

'তুমি ওসব বুঝবে না। ভগবানকে কায়দা-কানুন মেনে চলতে হয়।

তা না হলে এই দুনিয়াটা কবেই অচল হয়ে বসে থাকত !'

ভগবান আমাকে বলল, 'চলবে, না মানে ? কথাটা বুঝিয়ে বলো ।'

'কি ভাবে চলবে ? মুহূর্তে যদি আমি তোমার এই স্লাইসকে লোহায় পরিণত করে দিই, তাহলে তুমি ওটাকে চিবিয়ে খেতে পারবে ?'

আমি বললাম, 'কিন্তু এই বোম্বাই শহরের এমন কতিপয় হোটেল আছে যেখানে স্লাইস রুটিগুলো লোহার মতোই হয়ে থাকে ।'

ভগবান আবার বলল, 'আমি যদি তোমার এই চায়ে বিষ মিশিয়ে দিই তাহলে তুমি মরে যাবে না ?'

'বোম্বেতে রোজ হাজার হাজার লোক বিষাক্ত চা পান করে থাকে ।'

'আমি যদি আলোর গতি এতখানি কমিয়ে আনি যে, সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত আসতে আলোর গতি ঘণ্টায় মাত্র তিন মাইল থাকবে, তখন তোমরা বাঁচবে কি করে ?'

এবারে আমি চুপসে গেলাম। ভগবান শেষ কথাটি তো ষোল আনাই ঠিক বলেছে। আমি তাড়াতাড়ি মাথা নত করে প্লেটে আমলেট খুঁজতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দাদর পুলের নীচে উপনীত হলাম। পুলের এক পাশে একটা মন্দির রয়েছে। মন্দিরে সাধু বাবারা গাঁজা-ভাঙ্গের রপ্ত করছেন। অন্যদিকে রেলওয়ে ষ্টেশনের লৌহ শলাকার পাঁচিল ঘেঁষে গোটা কয়েক শীর্ণকায় কুকুর শুয়ে আছে। তারও অদূরে রয়েছে রাশি রাশি ময়লা আবর্জনার স্তূপ। দাদর পুলে ওঠার সোপানের দু'পাশে লাইন দিয়ে বসে আছে ভিক্ষুকের দল। মোট কথা, চতুর্দিকেই বিস্মিত হবার মতো বহু দৃশ্যরাজী বিরাজ করছে।

ভগবান ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে ?'

'কেন ? শহরের ছেলেপিলেদের সাথে দেখা করবে বলেই না নিয়ে এলাম এখানে।'

'কৈ, তোমার সেই ছেলেপিলেরা কোথায় ?'

আমি বললাম, 'ছেলেপিলেদের সাথে পরিচিত হবার পূর্বে এটা বোধ হয় ভালো হবে, চলো আমরাও ছেলেদের বেশ ধারণ করি। এ কাজ তো তুমি স্বচ্ছন্দে করতে পারো। এতে কোন ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝামেলা নেই।'

পর মুহূর্তেই আমরা দু'জন শিশু বনে গেলাম। আমাদের পরনে বস্তির ছেলেপিলেদের মতো ময়লা ছেঁড়া প্যান্ট এবং আধ-ময়লা জামা ছিল। আমি জামরুল বিক্রি করার জন্যে একটা টুকরি সংগ্রহ করে নিলাম। ওদিকে ভগবানও একটা কাঠের ট্রে যোগাড় করে নিয়ে তাতে ছেলেদের রং-বেরং-এর ছড়াছবির বই সাজিয়ে নিল। আমরা তাড়াতাড়ি দাদর পুলের সোপান অতিক্রম করে ওপরে উঠে গেলাম এবং লোহার রেলিং-এর কাছে জামরুল আর বই'র পসরা সাজিয়ে বসে গেলাম।

'এ কি করছ? ঝটপট টুকরিটা তুলে নাও।'—পাশ থেকে এক বৃদ্ধা কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে বলল। বৃদ্ধার চেহারা যেমন ভূতুড়ে, তেমনি তার আওয়াজও কুশ্রাব্য। বৃদ্ধার টুকরিতে আমার মতো জামরুল রয়েছে।

আমি বললাম, 'এটা সরকারী পুল। এখানে যার ইচ্ছা সেই দোকান দিয়ে বসতে পারে। চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ না সবাই নিজের নিজের দোকান সাজিয়ে বসেছে। অতএব আমি কি অপরাধ করেছি যে এখানে বসতে পারব না? এটা কি তোমার বাবার পুল?'

বৃদ্ধার সামনে বছর আটেকের একটা গাট্টা-গোট্টা ছেলে টুকরি সাজিয়ে বসেছিল। তার টুকরিতে কলা ছিল। আমার কথা শুনে আমাদের দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'টুকরি ওঠাবে, কি উঠাবে না তাই বল।'

আমি কোন কিছু জবাব দেবার আগে ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে নিলাম। বয়েসে লম্বায় আমার চাইতে কম মনে হলো। তাই আমি ঘাড় বাঁকা করে বললাম, 'না, উঠাব না—এখানেই বসব।'

দুই

ছেলেটি উদ্যত সাপের ফণার মতো ফোঁস করে উঠল।

পরমুহূর্তেই দেখলাম তার একটা পা আমার পেটে, একটা ঘুষি আমার মুখের উপর আর আমি মাটিতে চিৎপটাং। ভগবান আমাকে বাঁচাতে এলে একটা প্রচণ্ড ঘুষি তার মুখেও পড়ল। ভগবানের নাক থেকে দর দর করে রক্ত ঝরতে লাগলো।

'টুকরিটা তোল।'

ছেলেটা আমার উপর হুকুম চালাল, আমি ভগবানের দিকে তাকালাম। ভগবান তখন নাকের রক্ত মুছছিল এক মনে। আমি আর তার দিকে না তাকিয়ে নির্বিবাদে টুকরিটা তুলে নিলাম। তারপর পায় পায় আমরা দু'জন সামনের দিকে পা চালিয়ে দিলাম।

কয়েক পা এগিয়ে আসার পর ভগবান আমাকে বলল, 'জানো, ছেলেটাকে নিমেষে কুপোকাৎ করে ফেলতে পারতাম, হতভাগা চোখেমুখে সর্ষেফুল দেখতো, কিন্তু এসব আমার নীতিবিরুদ্ধ যে।'

'তাকি আর বলতে?' আমি কোমরে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম।

আরো একটু এগিয়ে যেতেই অন্য একটা ছেলের দেখা পেলাম। সে একটা কাঠের উপর রেখে ক'টা ফাউন্টেন পেন বিক্রি করছিল। সে ক্রমাগত হাঁকছিল—'আসল শেফার্ডস পেন, মাত্র চার আনা, আসল শেফার্ডস্……'

ভগবান বিস্মিত হয়ে আমাকে বলল, 'আসল শেফার্ডস পেন তো পঁচাত্তর টাকাতে মেলা দায়। অথচ চার আনায় সে বিক্রি করছে কেমন করে?'

আমি বললাম, 'হতে পারে ছেলেটির বাবা কোটিপতি।'

আমি চারদিকে ইতিউতি করে বললাম, 'চলো, এই ছেলেটার কাছেই আমরা বসে পড়ি।'

আমাদের আসতে দেখেই ছেলেটি চেঁচিয়ে উঠল, 'এদিকে এসো না যেন, অন্যদিকে দেখো। আমার বেচা বিক্রি মাটি করো না।'

আমি বললাম, 'দোস্ত, আমার কাছে রয়েছে জামরুল আর ওর কাছে রয়েছে ছবির বই, তুমি তো বিক্রি করছ কলম, তোমার ক্ষতি হবে কেমন করে?'

ছেলেটি কণ্ঠে ঝাঁজ মিশিয়ে বলল, 'তোমাদের মতো আনাড়ীদেরকে বোঝানো মুশকিল। এ তল্লাটে নতুন এসেছো মনে হচ্ছে। বেচা-বিক্রি কোনদিন করেছ বাপের জন্মে? খদ্দেরের মেজাজ জানো কিছু? এই পুলে এসে লোকদের মেজাজ কিভাবে বদলে যায় তা আমি জানি। কলম কেনার জন্যে এসে বহু লোক শেষে জামরুল বিনে চলে যাবে। অতএব আগেভাগেই কেটে পড়ো।'

ছেলেটি দেখতে আমাদের চাইতে বেশ তাগড়া ছিল।

আমার আর দ্বিরুক্তির সাহস হলো না। সেখান হ'তে পাততাড়ি গুটালাম।

কিছুদূর এসে ভগবান বলল, 'তুমি হয়ত ভাবছ ছেলেটি আমাদের চাইতে তাগড়া। জানো, আমি ওকে জন্মের মত শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু আগেই বলেছি এসব আমার নীতিবিরুদ্ধ কাজ।'

'তাতো বটেই!' আমি সম্মতিসূচক মাথা দোলালাম।

এবারে আমরা পুলের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি। পুরোটা পুলে কেউ আমাদের বসতে দিল না, শেষ প্রান্তে এসে দেখি এখানে এক ছেলে। না, ছেলে বলা ঠিক হবে না। রীতিমতো যুবকই বলা চলে তাকে। বিশ-বাইশ বছরের যুবক। ছেলেটির হাতে রং-বেরং-এর রুমাল। রুমালগুলো একটা ছাতাতে সাজিয়ে নিয়েছে। সে যখন ছাতাটি চক্রাকারে ঘুরাতে থাকে, তখন মনে হয় একটা রঙধনু চক্র রচনা করেছে।

ভগবান গলার স্বরটা অত্যধিক মোলায়েম করে তাকে বলল, 'আমরা কি তোমার পাশে বসে একটু বেচা-কেনা করতে পারি?'

সে বলল, 'বসতে পারো, তবে তাড়াতাড়ি চার আনা পয়সা বের করো।'

ভগবান তাড়াতাড়ি পকেট থেকে আট আনা পয়সা বের করে তার হাতে দিল। আমরা দু'জন নিশ্চিন্ত মনে তার পাশে পসরা সাজিয়ে বসে গেলাম। এভাবে ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। আমি অনেক কষ্টে দু'আনার জামরুল বিক্রি করলাম। কিন্তু ভগবান একটি বইও বিক্রি করতে পারলো না। ভগবান নিরাশ হয়ে বলল, 'আমি কত আশা নিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে ছড়া-ছবির বই নিয়ে এলাম, অথচ কিনা একটি বইও.....'

যুবকটি এ কথা শুনে হাসতে লাগলো।

ভগবান বলল, 'এতে আবার হাসবার কি আছে? কেন, বোম্বাই শহরে পেলেপিলেরা পড়াশুনা করে না?'

'পড়বে না কেন? আলবত পড়ে, আমি নিজে বি. এ. পাস।'

'বি. এ. পাস করে তুমি রুমাল বিক্রি করছ?'

ভগবানের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত।

যুবকটি আবার হাসল। একটা বিশেষ ধ্বনি তুলে সে পাশের ছেলেটিকে ডেকে বলল, 'ভিক্টর এদিকে আয়তো।'

ভিক্টর ঘড়ি বিক্রি করছিল।

কাছে আসতেই ভিক্টরকে আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও, এর নাম ভিক্টর। এম. এ. পাস।'

এরপর সে অন্যান্যদের সাথেও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ওর নাম শরিফ। এণ্ট্রান্স পাস।'

'এর নাম ধুলি। অষ্টম শ্রেণী পাস। ওর নাম ফিরোজ, সপ্তম শ্রেণী পাস। আর ওর নাম গুর খাঁ, পঞ্চম শ্রেণী পাস করে মেয়েদের চুড়ি বিক্রি করছে।'

ভগবান ওদের দিকে চোখ ছানাবড়া করে একবার দেখে বলল, 'তাতো বুঝলাম। কিন্তু স্কুল-কলেজে তোমরা যাও কখন?'

'স্কুল-কলেজে আমরা কোনদিন যাই না।' সমস্বরে সবাই অট্টহাসি

করে হেসে বলে উঠল।

'তাহলে তোমরা নিজেদেরকে বি. এ. পাস, ম্যাট্রিক পাস কেমন করে বলো?'

'এজন্যে বলি যে, আমরা যথা সময়ে যদি স্কুলে যেতে পারতাম, তাহলে আজ বি. এ. পাস করতাম, শরিফ এণ্ট্রান্স পাস করতো। আর গুর খাঁ ক্লাশ ফাইভে পড়তো, তাকে আর মেয়েদের চুড়ি বেচতে হতো না।'

আমাদের চারদিকে একটা ভীড় জমে উঠেছে দেখে এক পুলিশ হাওলদার হাঁকতে হাঁকতে দৌড়ে এলো। হাতে তার ছোট একটা বেতের ছড়ি। আন্দোলিত করতে করতে বলল, 'কি হচ্ছে এখানে, কি হচ্ছে?'

'না, তেমন কিছু নয়, হাওলদারজি। এ দুটো নতুন ছোকড়া রংবাজ এসেছে এই পুলে। এখানে বেচা-কেনা করতে চায়।' ভিক্টর বলল।

পুলিশ বলল, 'না, এখানে কোন বেচা-কেনা চলবে না, সব বে-আইনী কাজ।'

'ঝটপট দু'টো টাকা বের করো।' ভিক্টর আস্তে করে আমার কানে কানে বলল।

'যদি দুটো টাকা না দিই?' ভগবান পাশ থেকে বলল।

'তাহলে পুলে বেচা-কেনা করা বে-আইনী হবে।'

'হুম!' বলে ভগবান কতক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর পকেট থেকে দু'টো টাকা বের করে ভিক্টরের হাতে দিল। ভিক্টর পুলিশকে একটু দূরে নিয়ে কি যেন বলাবলি করল। পুলিশ সেখান থেকে চলে গেল। তারপর সবাই আবার যার যার দোকানে ফিরে গেল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা অতিক্রান্ত হলো। ভগবানের একটি বইও কেউ কিনল না। লোকজন এসে রুমাল এবং জামরুলের দোকানে ভীড় জমাতে লাগল। কিছু কিছু লোক ফাউন্টেন পেন, মোজা, চুড়ি, হেয়ার পিন, রিবন ইত্যাদিও কিনতে লাগল। কিন্তু ভগবানের বই'র দোকানের কাছে

কেউ ভুলেও ঘেঁষলো না।

'কি বিচিত্র এই দেশ!' ভগবান দীর্ঘ নিশ্বাস টেনে বলল, 'আমি ভাবছিলাম, ছেলেপিলের বাবারা এই সুন্দর সুন্দর ছবির বইগুলো কিনে তাদের সন্তানদের উপহার দেবে। কিন্তু আমি তার সে রকম কোন লক্ষণই দেখছি না।'

'যেসব বাবাদের কাছে শুধু স্কুলের পাঠ্য বই কেনার পয়সা নেই, তারা তোমার ছড়া-ছবির বই কিনবে কোন দুঃখে?' আমি ভগবানের মন্তব্যের প্রতিবাদে বললাম।

তিন

ভগবান আমার কথার একটা মোক্ষম জবাব খুঁজছিল, এমন সময় নিচের দিকে একটা শোরগোল শোনা গেল। চেয়ে দেখলাম, একটা লম্বা-চওড়া লোক এদিকে আসছে। গলাতে একটা গোল তাবিজ, গায়ে চটকদার জামা, পরনে একটা পাতলুন। পাতলুনের মুড়ি গোড়ালীর ওপরে তোলা। পায়ে পায়ে সোপান পেরিয়ে ক্রমশঃ নবাবী ঢং-এ পুলের উপর দিকে উঠে আসছে। তাকে দেখেই ভিখারীরা দাঁড়িয়ে গেল এবং মাথা নত করে সম্ভ্রম প্রকাশ করল। পথচারীরা তার দিকে তাকিয়ে কানাঘুষা করতে লাগল। পায়ে পায়ে আরো কাছাকাছি আসতেই রুমাল বিক্রেতা সোজা বত্রিশ দাঁত বের করে একটা সেল্যুট মারল। সাথে সাথে ভিক্টর, শরীফ, গুর খাঁ—সবাই সেল্যুট করল। আমরা দু'জন যেমন ছিলাম তেমনই দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কোন রকম সম্ভাষণ না পেয়ে আমাদের দিকে একটা জ্বালাময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পা-টা এগিয়ে দিলো ভগবানের টুকরির দিকে। এক ঝটকায় টুকরিটা দূরে সরিয়ে দিয়ে ভিক্টরকে জিজ্ঞেস করলো, 'এরা আবার কোত্থেকে এসে জুটলো এখানে?'

ভিক্টর আমতা আমতা করে বলল, 'দাদা···দাদা, ছোকড়া দু'টো নতুন

এসেছে। এখানে ধান্ধাবাজী করবে, হাবিলদারজী রাজী আছেন।'

শুনে দাদা হাবিলদারের উদ্দেশ্যে কষে গালি ছুঁড়লেন এবং সবশেষে বললেন, 'এদেরকে বলো নিয়মিত আমার রোজকার চার আনা দিতে পারলে এই পুলে ঠাঁই পাবে।'

'হাবিলদার অনুমতি দিয়েছেন। সরকারের লোকরা যেখানে অনুমতি দিয়েছে, সেখানে তুমি বারণ করার কে শুনি?' ভগবান রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল।

'আমি কে?' বলেই দাদা আস্তিন গুটাতে লাগল। 'দাঁড়া, দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি কে?'

পরমুহূর্তেই দাদা ভগবানের আস্ত টুকরিটা তুলে ছুঁড়ে মারল। টুকরির সুন্দর সুন্দর ছবির বইগুলো পাখীর পালকের মতো বাতাসে উড়তে উড়তে বিক্ষিপ্তভাবে অদূরে রেললাইনে গিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পরবর্তী পর্যায়ে আমার জামরুলের টুকরিটাও। জামরুলগুলোও রেললাইনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। জামরুলগুলো পড়তেই কোত্থেকে এক পাল ছেলে-ছোকড়া বেরিয়ে এলো এবং তুলে তুলে তা পরমানন্দে খেতে লাগল। কিন্তু কি আশ্চর্য, ছেলেগুলো ছবির একটা পাতাও ছুঁল না। ভগবানের দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এলো। ভিক্টর এবারে আমাদের কাছে এসে বলল, 'ইনি হলেন, এই পুলের দাদা। মনে কর ইনিই মালিক। তার বিনা অনুমতিতে এখানে কারো বসার সাধ্য নেই। যা করেছ, ক্ষমা চেয়ে নাও আর চার আনা পয়সা আগেই দিয়ে ফেলো। নয়তো সব সময় তোমাদের হয়রাণ করবে।'

'কিসের চার আনা? এক পয়সাও দেব না এবং এ পুলে বসেই বেচা-কেনা করব, দেখি কে ঠেকায়?'

দাদা দাঁতে দাঁত ঘষে ভগবানের গলা টিপে ধরল এবং কোমর হাতড়ে একটা লম্বা কালো চাকু বের করে নিলো। পেছন থেকে আমি তার পা কামড়ে ধরলাম। সে আমার দিকে ফিরতেই কৌশলে আমরা দু'জনে দিলাম ছুট। দাদাও আমাদের পিছু নিলো। কিন্তু আমরা দৌড়াতে দৌড়াতে রণজিৎ ষ্টুডিওতে এসে ঢুকে পড়লাম। এই

এলাকার দাদা হলেন, আবার অন্যজন। এজন্যে সে আর ষ্টুডিওতে ঢোকার সাহস পেল না। নিষ্ফল আক্রোশে আমাদের গালি দিতে দিতে ফিরে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা যাবৎ আমরা রণজিৎ ষ্টুডিওর কলা বিভাগের তিন মাথা বিশিষ্ট ব্রহ্মমূর্তির পেছনে আত্মগোপন করে থাকলাম। তারপর এক সময় নিরাপদ মনে করে বেরিয়ে পড়লাম। ভয়ে তখনো বুক দুরু দুরু করছিল। তখন লাঞ্চের সময় ছিল এজন্যে কলা বিভাগে কোন লোক ছিল না। ভগবান ব্রহ্মমূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তিন মাথা বিশিষ্ট মূর্তিটা ব্রহ্মাজীর, না?

'হাঁ।'

'ব্রহ্মার পূজা হয় এখানে নিশ্চয়ই?'

'না ভগবান, এখানে নগদ লেনদেনের কারবার। এখানে একমাত্র টাকা-পয়সারই পূজা হয়ে থাকে। এ তো প্লাষ্টার নির্মিত ব্রহ্মমূর্তি। প্রয়োজনে ছবির সেটে রাখা হয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এইব্রহ্মার মাটি দিয়েই আবার রাবণ তৈরী করা হবে।'

'হুম।' ভগবানকে একটু চিন্তান্বিত দেখালো।

'কিছু বলছিলে?' আমি বললাম।

'না, আজ বেশ মনে পড়ছে, সৃষ্টির আদিতে আমি যখন ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলাম, সে আমার কাছে তিনটা মাথা চেয়ে বসেছিল। আমি ভ্রূ-কুঁচকে বলেছিলাম, তিনটা মাথা দিয়ে কি হবে? কিন্তু ব্রহ্মা নাছোড়বান্দা হয়ে বলেছিল, না, তিনটা মাথা দিতে হবে আপনাকে। তিনটা মাথা দিলে আমার কিইবা এমন ক্ষতি। তাই আমি তাকে তিনটা মাথাই দিয়েছিলাম। কিন্তু সে সময় তিনটা মাথা চাওয়ার তাৎপর্য আমার বোধগম্য হয়নি। কিন্তু আজ যখন গুণ্ডারা আমার গলা টিপে ধরল, আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করলাম, দাদার পুলে যারা কেনা-বেচা করতে চায় তাদের ঘাড়ের উপর চারটা মাথা থাকা দরকার। এতদিনে বুঝলাম ব্রহ্মা আমার কাছে তিনটা মাথা কেন

চেয়েছিল।' বলেই ভগবান একটু মুচকি হাসল।

'ব্রহ্মা তিনটা মাথা কেন চেয়েছিল সেটা তুমিই ভালো বলতে পার। যেমন তুমি, তেমনি তোমার ব্রহ্মা। তবে আমি জানি, এই দুনিয়াতে একটা মাথাই বাঁচিয়ে রাখা দায়, আর তিনটা মাথা হলে এত খাবার-দাবার কোত্থেকে জোটে।'

খাবার-দাবার প্রসঙ্গে আসতেই আমার খুব ক্ষুধা পেতে লাগল। ভগবান বলল, 'তোমার তো আর কাজ নেই, শুধু ক্ষুধা আর ক্ষুধা।'

'কেন, তোমার ক্ষুধা পায় না?'

'না। আমার কোন ক্ষুধা নেই। তবে কখনো কখনো আমার মাথা ব্যথা হয়ে থাকে।' ভগবান মুখটা গম্ভীর করে বলল।

'মাথা ব্যথা? কখন হয় সেটা?'

'যখন কোন তারকা কক্ষচ্যুত হয়, যখন কোন শিশু মায়ের কোল খালি করে চলে যায় আর যখন কোন ফুল নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঝরে যায়।'

ব্যথাটা কি তখন মাথাতে হয়ে থাকে, না অন্তঃকরণে?'

'মাথাতেই। অন্তঃকরণ বা হৃদয় বলে তো আমার কিছু নেই। আমি এমন কি দেবতাদেরকেও হৃদয় দিইনি। হৃদয় শুধু আমি মানব জাতিকে দিয়েছি। কারণ মানুষ জাতের পক্ষে পাপাচার করা সম্ভব।'

আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম আর ভগবানকে দেখছিলাম আড়চোখে। ভগবানের চেহারাতে কোন ভাবলেশ ছিল না। অভিব্যক্তিতে কোন দর্শন ছিল না। শিশুর মতো নিষ্পাপ অনাবিল একখানি মুখ। সহসা আমার মনে হলো, আমাদের কাছেই একটা গণেশ শুর উত্তোলন করে ভগবানের পদযুগলের কাছে ভক্তি নিবেদন করল। হঠাৎ ভগবান আমাকে বলল, 'চলো, তোমার ক্ষুধা পেয়েছে, তোমার ক্ষুধা মিটিয়ে দিই।'

'অসম্ভব। মানুষের ক্ষুধাও কেউ কোনদিন নিবৃত করতে পারে?'

রণজিৎ ষ্টুডিওর কেন্টিনে ঢুকে আমি প্রথমে 'কোকা কোলা' পান করলাম। তারপর ডাল ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই, বিরানী এবং ক্ষীর-মালাই উদরস্থ করলাম। ভগবান কিছুই নিল না। তার জন্যে শুধু দু'টো

এসপ্লোর বড়ি নিল। খেয়ে-দেয়ে যখন বিল দেবার পালা এলো ভগবান মানিব্যাগ বের করতেই ভেতর থেকে দশ টাকার বহু নোট উঁকি দিল। পাশে এক ফিল্মষ্টার বসেছিল। এত টাকা দেখে তার চক্ষু চড়ক গাছ আর কি!

ফিল্মষ্টার-এর নামে ছিল টিক্কু। ছবিতে বাচ্চাদের ভূমিকাতে সে একচেটিয়া। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কমেডিয়ান হিসেবেও মন্দ না। কিন্তু ইদানীং তার দিনকাল ভালো যাচ্ছিল না। যেভাবে টিক্কু আমার প্লেটের দিকে তাকাচ্ছিল তাতেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম তার পকেটের অবস্থা। তাছাড়া দাদর পুলের কাছের চৌরঙ্গীর পানের দোকানে মাঝে মাঝে দেখা হতো তার সাথে, তখন দু'চার আনা ধার কর্জ নিতো আমার কাছ থেকে। অবশ্য যখন আমার কাছে পয়সা থাকত।

টিক্কুর মুখাবয়ব নিষ্পাপ শিশুর মতো ভাবলেশহীন। দেখে মায়া হয়। তার উচ্চতা আমাদের চেয়েও এক ফুট কম। টিক্কু একটু সৌজন্যমূলক হাসি হেসে ভগবানের কাছ ঘেঁষে বসল।

'বোম্বেতে নতুন এসেছ, না?'

টিক্কু আমার প্লেটের দিকে চোখ ছানাবড়া করে তাকিয়ে বলল। দু'একবার জিভও চেটে নিলো অলক্ষ্যে।

ভগবান বলল, 'হাঁ, আজই এসেছি।'

'ছবিতে কাজ-কাম করার ইচ্ছে আছে নাকি?'

'ছবিতে? কিন্তু সুযোগ কোথায়?'

'আছে বৈ কি! তোমার মা-বাপ কোথায়?'

'মা-বাপ তো নেই আমার।' ভগবান নেহাত অনাথের মতো বলল।

টিক্কু এবার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল এবং ভগবানের কাঁধে হাত রাখল। আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ও তোমার ছোটভাই, না?'

'না, ও আমার এক বন্ধু।' ভগবান বলল।

চার

টিক্কু আমার দিকে চরম সন্দেহের চোখে তাকাল। তার চোখ দেখে মনে হলো, আমি বন্ধু না ছাই—আমি একটা চোর ছাড়া কিছু না। তার এ ধারা দৃষ্টিপাতের জবাবে আমিও তার দিকে একটা বিরূপ ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করলাম।

'তাহলে তোমার বন্ধুও ছবিতে কাজ করতে এসেছে?'

'জানি না তার মনোভাব কি। তাকেই জিজ্ঞেস করো।' ভগবান বলল।

'জিজ্ঞেস করে আর কি হবে? এই চেহারা নিয়ে সারা জীবন সাধনা করেও সে ফিল্মে চান্স পাবে না।'

টিক্কু আর একবার আমার দিকে শ্যান দৃষ্টিতে তাকাল। ভগবান বলল, 'আর আমি? আমার চেহারাটা···?'

'তোমার? তোমার চেহারাতে বরং একটা আকর্ষণ আছে। তোমার চেহারাতে এমন একটা সহজাত লাবণ্য রয়েছে যা কিনা ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির সকল শিশু-শিল্পীর চেহারা ম্লান করে দিতে পারে। তোমার একটা আদর্শ চেহারা বটে!'

'আর আমার চেহারাটা এবড়ো-খেবড়ো, তাই না?'

টিক্কুর কথা শুনে আমার গা জ্বালা করছিল। এ কথাটাই আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। এ সময় টিক্কু আমাকে ঠিক চিনে উঠতে পারল না। কেননা, আমি তো আর আমি নেই। একজন শিশুতে রূপান্তরিত হয়েছি আমি। আর আমি যদি এ সময় শিশু না হয়ে আসল চেহারায় থাকতাম, টিক্কুর অবস্থা কাহিল করে দিতাম।

টিক্কু আমার কথা না শোনার ভান করে ভগবানকে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কি?'

'ভগবান।'

'তোমার বয়স কত?'

'আমি বলতে পারব না।'

'দেখতে তো আমারই মতো। বড় জোর বার বছর হবে।'

'তোমার তাহলে মাত্র বার বছর বয়েস?' ভগবান পাল্টা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, আগামী ক্রিসমাসের সময় বার বছর পুরো হবে।'

টিক্কু নেহাত বিনীতভাবে বলল। তারপর খুবই সোহাগভরে হাত দু'টো ভগবানের কাঁধের উপর রেখে বলল, 'জানো, আমার নাম কিন্তু টিক্কু। ফিল্ম লাইনে আমি আজ ত্রিশ বছর যাবৎ, আরে না না, মাত্র তিন বছর যাবত কাজ করছি। চাইল্ড ষ্টারদের মাঝে আমার নাম একেবারে পয়লা নম্বরে! কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে কোন ক্রমেই আমি তোমার কাছ ঘেঁষতে পারব না, অর্থাৎ কিনা তুমি যদি এ লাইনে সত্যিকার পদার্পণ করো। আমি লক্ষ্য করছি, তোমার চোখে একটি বিশেষ লক্ষণ প্রতিভাত হচ্ছে…'

'তার মানে?'

টিক্কু কথাটি না শোনার ভান করে বলেই চলল, 'তুমি যদি আমার কথা মতো চলো, তাহলে আমি তোমাকে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রির সবচাইতে বড় ষ্টার বানিয়ে দেব। সবচাইতে বড় চাইল্ড ষ্টার ডেইজি ইরানী কত টাকা পায় জানো?'

'কত পায়?'

'প্রতি ছবির জন্যে ত্রিশ হাজার।'

'ত্রিশ হাজার? না, এ কোনদিন সম্ভব নয়। দশ বছরের এক শিশু শিল্পীর জন্যে এত টাকা?'

'ডেইজির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সোমী কত পায় জানো?'

ভগবান নেতিবাচক ইঙ্গিত করে বলল, 'না, জানি না তো।'

'চল্লিশ হাজার!'

'জানো, আজ থেকে পনের বছর আগে, মানে পাঁচ বছর, আরে বছর নয়, পাঁচ মাস আগে এই অধমই সোমীকে সর্বপ্রথম ছবিতে

কাজ করার সুযোগ করে দেয়।'

'বাব্বা, চল্লিশ হাজার! আর আমি কিনা মাত্র দু'শো টাকা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছি। একত্রে দু'শো টাকার বেশী আমি কোনদিন দেখিওনি।'

'দেখনি? চলো আমার সাথে। আমি ফিল্ম ডাইরেক্টরের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'

টিক্কু ভগবানকে একরকম টেনেই নিয়ে চলল।

'আরে ভগবান, আমাকে ফেলে তুমি কোথায় চললে? আমি তোমার সাথে আসছি।'

'তোমার আসতে হবে না। তুমি এখানেই বসো, আমি এই এলাম বলে।'

'কিন্তু, কিন্তু···'

'আমি ফিল্ম ষ্টার হতে চললাম।'

আমি দাঁতে দাঁত পিষে কেন্টিনেই বসে পড়লাম।

প্রায় একঘণ্টা পর ভগবান ফিরে এলো, কিন্তু একাকী।

'টিক্কু কোথায়?'

'সে ওখানেই রয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যার দিকে 'হিন্দুমাতা' সিনেমার কাছে আমাদের দেখা হবে।'

'আসলে ব্যাপারটা কি? হতভাগা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে?'

ভগবানকে বেশ হাসি খুশী লাগছিল। ঠোঁটে একঝিলিক হাসি লেগে আছে।

'ক'দিনের মধ্যে আমিও একজন ফিল্মষ্টার হতে যাচ্ছি। স্বর্গে গিয়ে আমার আর কাজ কি? শুনতে পাচ্ছ? আমি কিন্তু আর স্বর্গে ফিরে যেতে চাই না। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমার স্যুটিং শুরু হবে। প্রথম ছবিতেই ওরা আমাকে ত্রিশ হাজার দিতে রাজী হয়েছে। থাকার জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটা ফ্লাটও আমার জন্যে খালি করা হচ্ছে। ভ্রমণের জন্যে একটা কেডিলাক গাড়ীও পাচ্ছি। এসব ছেড়ে কোন বোকা স্বর্গে যেতে চায়?' স্বর্গে যা পাব না, আমি

তার সবই এখানে পাব। পত্র-পত্রিকায় আমার রঙ্গিন ছবি ছাপা হবে, আমার নাম নেবে সবাই।'

'তোমার নাম তো এমনিতেই সবাই নিয়ে থাকে। সব জায়গাতে বিছমিল্লাতেই তোমার নাম উচ্চারণ করা হয়।'

'সবাই তো নেয়। কিন্তু খবরের কাগজে তো আমার নাম থাকে না। মসজিদ, মন্দির, গুরুদ্বার, গির্জা—সর্বত্রই আমার নাম উচ্চারণ করা হয় মানি, কিন্তু খবরের কাগজে আদ্যোপান্ত চষে বেড়ালেও আমার নাম পাওয়া যায় না। এমন কি নাইট ক্লাব, হোটেল ইত্যাদিতেও আমার নাম নেই। মোটকথা সব রকম চমকপ্রদ স্থানগুলোতে আমার এ অনুপস্থিতি আমার সহ্য হয় না। কত আনন্দ, এখন থেকে 'মুভি কেয়ার' পত্রিকাগুলোতে আমার ছবির পূজা করা হবে। নিরূপা রায়ের মতো অভিনেত্রীর সাথে আমি অভিনয় করবো। আর জান, অশোক কুমার এবং প্রাণও এ ছবিতে থাকছে।'

বলতে বলতে ভগবান খুশীতে একেবারে নেচে উঠল। আমি ভগবানকে নিরস্ত করে বললাম, 'তুমি একটা বোকার হদ্দ। তুমি যদি এসব করে বেড়াও তো বিশ্ব-সংসার কে চালাবে?'

'চুলোয় যাক তোমাদের বিশ্ব।' ভগবান অনেকটা বিরক্তি ভরে বলল। 'জানো, এই তোমাদের দুনিয়ার কথা ভাবতে গেলেই আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়।'

শুনতে শুনতে আমি একেবারে ঘেমে উঠলাম। তাড়াতাড়ি একটা 'কোকা কোলা' এনে তেষ্টা মেটাতে মেটাতে বললাম, 'কিন্তু এসব এত তাড়াতাড়ি পাকাপাকি হয়ে গেল কেমন করে?'

'শুধু আমার চেহারা দেখেই। এমন নিষ্পাপ আর নির্মল চেহারা নাকি আর হয় না। জান, টিক্কু ছেলেটা বড় ভালো। প্রথমে সে আমাকে সহকারী পরিচালকের কাছে নিয়ে গেল। সহকারী পরিচালক সহানুভূতিশীল মন নিয়ে আমার করুণ জীবন বৃত্তান্ত শুনলো এবং যখন জানল যে, আমার মা-বাপ কেউ নেই আর আমি ছবিতে

কাজ করতে ইচ্ছুক—তখন আমার প্রতি বেশ সদয় হলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার পকেটে দু'টো টাকা হবে?'

আমি বললাম, 'হবে।'

বললেন, 'আমাকে দাও, ডিরেক্টর আজ আমাকে লাঞ্চের টাকাটা দেয়নি। তোমার টাকাটা কালকে নিয়ে নিও। ছবিতে চমৎকার একটা রোল আছে। ওটা তোমারই জন্যে বরাদ্দ থাকল। শিশু-শিল্পী হিসেবে তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে চারদিকে। দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি ডিরেক্টরের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।'—এসব শুনে আমি তাকে দু'টো টাকা দিয়ে দিলাম।

আমি ঠোঁট উল্টিয়ে বললাম, 'শেষ অব্দি টাকা দু'টো দিয়েই দিলে?'

'হাঁ, কারণ সে পরক্ষণেই আমাকে ডিরেক্টরের সাথে দেখা করবার জন্যে নিয়ে গেল। ডিরেক্টর ছবির একটা শট্ নেয়ার ব্যাপারে খুবই ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু টিক্কু এবং সহকারী পরিচালক যখন কানে কানে বলল—সুন্দর নাদুস নুদুস একটা ছেলে পাওয়া গেছে। শিশু-শিল্পী হিসেবে তাকে অপূর্ব মানাবে তখন ডিরেক্টর হন্ত-দন্ত হয়ে ছুটে এলো এবং আমার আদ্যোপান্ত করুণ কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনল। যখন সে জানতে পারল যে, আমি পিতৃমাতৃহীন তখন ডিরেক্টর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপাততঃ গোটা দশেক টাকা হবে তোমার কাছে? আমি জানালাম, হবে। তখন সে আমাকে বলল, টাকাটা দিয়ে দাও। কালকে ডিষ্ট্রিবিউটরের চেকটা এলেই তোমার টাকাটা পেয়ে যাবে। আমার আগামী ছবিতে তোমাকে চান্স দিচ্ছি। এসব শুনে আমি তাকে দশ টাকা এগিয়ে দিলাম। এরপর টিক্কু আমাকে ছবির ডিষ্ট্রিবিউটরের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গেলে। ডিষ্ট্রিবিউ-টর কোলকাতার কলের জন্যে টেলিফোনের সামনে বসেছিল। আমার কথা শুনে সেও ছুটে এলো। অনুরূপভাবে সেও আমার করুণ জীবন বৃত্তান্ত মনোযোগ দিয়ে শুনল। আমার কাহিনী শুনতে শুনতে যখন জানতে পারল যে, আমার মা-বাপ নেই, তখন চোখ দু'টো তার অশ্রুসজল হয়ে উঠল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বলল, তোমার

পকেটে টাকা আছে? অল্প সময়ের জন্যে গোটা পঁচিশেক টাকা হবে? আমি কালই একটা চেক পাচ্ছি। কাল তোমার টাকাটা দিয়ে দেব। তোমার সাথে কালই আমাদের পাকাপাকি ত্রিশ হাজার টাকার কনট্রাক্ট সেরে ফেলব। এসব শুনে ডিস্ট্রিবিউটারকেও আমি পঁচিশ টাকা দিলাম। কেমন মনে হয় তোমার? অশোক কুমার, প্রাণ আর নিরূপা রায়ের সাথে পত্র পত্রিকায় চমৎকার লেটারিং-এ আমার নামটাও থাকবে।'

বলতে বলতে ভগবান আর একচোট হেসে নিলো। সারা দেহ-মনে আনন্দ উছলে পড়ছিলো যেন তার।

এতক্ষণে আমি মুখ খুললাম। বললাম, 'সবাইতো নিলো, টিক্কু কিছু নিলো না তোমার কাছ থেকে?'

'না, তবে সে প্রথম যাত্রাতেই গোটা পাঁচেক টাকা নিয়েছিল, সে টাকা তো কালই দিয়ে দিচ্ছে সে। আজ বিকেলে হিন্দুমাতা প্রেক্ষাগৃহের কাছে আমাদের আবার দেখা হবে। সেখান থেকে আমরা একটা নতুন ফিল্ম কোম্পানীর উদ্দেশে রওনা হবে। টিক্কু বেশ ছেলে।'

'টিক্কু বেশ ছেলে না ছাই! হারামজাদার বয়েস যে চল্লিশ তা কি তুমি জান না? খোদার কসম, তোমার মত এমন বোকা আমি আর দেখিনি।'

ভগবান চোখ ছানাবড়া করে আমার দিকে তাকাল। কিছুই যেন বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছিল আমার ক্রুদ্ধ মুখাবয়ব। ভগবানের অসহায় অভিব্যক্তি দেখে আমার মায়া হলো। কেন মিছেমিছি তাকে অদুঃখ দিলাম। আমি হেসে উঠে তার হাত চেপে ধরে বললাম, 'যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। চলো ভালোয় ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়ি। নয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই তোমার পকেট খালি হয়ে যাবে।'

বিকেল পাঁচটায় আমরা দু'জনে হিন্দুমাতা প্রেক্ষাগৃহের কাছে টিক্কুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু টিক্কুর টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না।

পাঁচ

রাতে খোলার ঝুপড়িতে চাটাই বিছিয়ে আমরা দু'জন পাশাপাশি শুয়েছিলাম। শোবার পূর্বক্ষণে আমরা আমাদের পুরনো বেশে ফিরে এলাম। মনেই হবে না যে, কিছুক্ষণ আগে আমরা দুটো নধরকান্তি বালকের বেশে ছিলাম। ভগবান দুটো হাতের অঞ্জলি রচনা করে তার উপর শুলো। আমি গায়ের পুরনো ছেঁড়া জামাটা খুলে দূরে ছুঁড়ে মারলাম। ভীষণ গুমট লাগছিল।

ভগবান বলল, 'ভীষণ গরম তো। তোমাদের এসব ঝুপড়িতে ইলেকট্রিকের ব্যবস্থা নেই?'

আমি বানিয়ে বললাম, 'ইলেকট্রিক ছিল বই কি। মাস তিনেক ভাড়া বাকী পড়েছিল, তাই লাইন কেটে দিল। তারপর থেকে অন্ধকারেই দিন কাটাচ্ছি।'

'সত্যি, ফ্যান না হলে যা অসুবিধে। বড্ড গরম লাগছে আমার। স্বর্গে থাকতে থাকতে অভ্যেসটা একেবারে যা তা হয়ে গেছে। একটু অসুবিধে হলেই বিতিকিচ্ছা লাগে।'

'যদি বলো একটা কথা জিজ্ঞেস করি ভগবান।'

'বলো।'

'স্বর্গ বলতে কোন কিছু আছে কি?'

'আছে।'

'নরক?'

'নরকও আছে।'

'পাপ?'

'আছে।'

'পুণ্য?'

'তাও।'

'পাপের জন্যে শাস্তি, পুণ্যের স্বর্গ?'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

'হ্যাঁ।'

'সত্যি, তুমি পাপীদের শাস্তি দাও?'

'দেই বই কি।'

'অথচ আমি বলি পাপীদের স্বর্গের প্রয়োজন সবচাইতে বেশী। পাপী—যাদের মন পাপাচারে অন্ধকার ছিল, যাদের হাত ছিল রক্তাক্ত, যাদের দৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতা উপচে পড়তো, যারা প্রতি পদে পদে পৃথিবীতে বাধা প্রাপ্ত হতো। আমি বলি, স্বর্গের প্রয়োজনটা তাদেরই সবচাইতে বেশী। কেননা, যেখানে অন্ধকার সেখানেই না আলো পৌঁছে দেবার প্রয়োজন। পাপাচারে যাদের হাত রক্তাক্ত, শুধু মাত্র তাদের জন্যেই ক্ষমা থাকা উচিত। কিন্তু তা না করে এমন বিধান কেন রেখেছ? যারা প্রথম থেকেই পূত-পবিত্র, যাদের প্রাণে পাপজনিত কোন অশান্তি ছিল না, তাদেরকেই বেছে বেছে শান্তির পারাবার স্বর্গে পাঠাচ্ছ। আর যারা সারা জীবন পাপাচারে বিদগ্ধ, পরকালে তাদেরকে পাঠাচ্ছ নরকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তুমি স্বর্গকে স্বর্গে পাঠাচ্ছ, আর নরককে নরকে পাঠাচ্ছ। আসলে এসব করার পেছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কি শুনি?'

'তা না করে আমি কি করব? আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে? তোমার কি ইচ্ছে?'

'আমার মতে, তুমি কখনো কখনো পাপী লোকদেরকেও এক আধবার স্বর্গে জায়গা দিও। পক্ষান্তরে, ভাল লোকদেরকেও নরকের শাস্তি ভোগ করতে দিও। প্রত্যেক লোকেরই এটা জানা উচিত—সে কি হারিয়েছে। যে পাপে ক্ষমা নেই এবং যে পুণ্যে বেদনা নেই, তার মাহাত্ম্য কোথায়?'

'তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, বিনা ক্লেশেই এসব কুঁড়েঘরে বিজলী বাতি আসুক! কিন্তু মিষ্টার, মানুষকে পরিশ্রম করতে হবে। নিজের বুদ্ধিবৃত্তি কাজে লাগাতে হবে। আমি তো তাদেরকে জন্ম দিয়েই ক্ষান্ত। ভালমন্দ সবকিছু তাদের প্রয়াসের উপর নির্ভরশীল। মানুষ চেষ্টা করেই তার ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে।'

'ললাটের লিখন মানুষ চেষ্টা করে কেমন করে খণ্ডাবে?'

'পারবে। পারবে বলেই তো এই গুরুদায়িত্ব মানুষকে দেয়া হয়েছে,

দেবতাদেরকে দেয়া হয়নি।'

এরপর বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। চারদিক নিথর। আমার চোখ ঘুমে ঢুল ঢুল। ভগবানের কতগুলো অস্ফুট কথা আমার কানে ভেসে ভেসে আসছিল।

ভগবান বলছিল, 'কিন্তু এই পাপ-পুণ্য, সাজা-পুরস্কার—এসবের ঊর্ধ্বে রয়েছে জন্ম এবং মৃত্যুর পরিক্রমা। জন্ম এবং মৃত্যু, কারো সাধ্য নেই একে নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক এই মুহূর্তে সৌরজগতে একটি তারকা উল্কা হয়ে ফেটে পড়ছে মর্তের মাটিতে। কি অভিনব তার নিমজ্জন। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে হাসতো খেলতো। আশায় পরিপূর্ণ ছিল তার প্রতিটি মুহূর্ত। হাসি-কান্না, দুঃখ বেদনা মিশ্রিত জীবনের এই কি পরিসমাপ্তি·····ঠিক একই সময়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপর প্রান্ত থেকে সম্পূর্ণ নতুন এক তারকা কি অপরাধ করেছিল যে, তাকে মৃত্যুবরণ করতে হলো এবং নবজাত তারকা এমন কি পুণ্য করছিল যে, এই মুক্ত আলো-বাতাস আর নীলাভ আকাশের উন্মুক্ত অঙ্গনে তার জন্ম হলো? তাই আমাকে অযথা পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক আলো-আঁধারকে একত্রিত করে একটি অস্তিত্বের ঘোষণা করেছি, সে হলো মানুষ। এখন আমি মানুষের পাপ-পুণ্যের আলাদা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চাই না। ওসব তোমাদের মাথাব্যথা, তোমরা ওসব নিয়ে ভাবো।'

ভগবানের সে অস্ফুট আওয়াজ আমার কানে ভেসে আসছিল। ভেসে আসছিল দূর দূরান্তের পাহাড় পর্বত উপত্যকা থেকে। আমি আধো ঘুম আধো জাগরণে ঝিমুচ্ছিলাম। হঠাৎই আমার মনে হলো কে যেন আমার পা চাপড়ে দিয়েছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ভগবান বলল, 'হতভাগা, এত সকালেই ঘুম আসছে তোর? এখন তো সবে রাত শুরু হলো।'

আমি ভ্যাবাচেকা খেয়ে বললাম, 'তুমিতো ভগবান, তোমার কি? ঘুম নিদ্রা বলে তো তোমার কিছুই নেই। কিন্তু আমি মানুষ বেচারীর তো ঘুম না গেলে চলবে না। সারা দিনের পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। আর শোনো, ওসব দুস্তি ইয়ার্কী আমার ধাতে সয় না। শোন, বঞ্চিত,

হতভাগ্য এসব কথা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগে। তোমার সাথে আমার দুস্তি খাটে? তুমি হলে গিয়ে ভগবান। তোমার সাথে আমার পাল্লা দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অতএব, মাফ করো, আমাকে একটু ঘুমুতে দাও এই মুহূর্তে।'

বলেই আমি পাশ ফিরে শু'লাম। ভগবান আবারও তেমনি অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলো, 'হায়, আমিই বা কি ধরনের জীবন গ্রহণ করলাম, একেবারে একা নিঃসঙ্গ। সবাই আমার পূজারী, আমার বন্ধু কেউ নয়। কারো পিঠ চাপড়ে শালা হতভাগা বলে একটা কথা বলতে পারি না। সারা সৃষ্টি জগতে এমন একজনও নেই যে আমাকে বন্ধু ভেবে দুটো গালি দেবে। হায়, দুঃসহ নিঃসঙ্গতা.....।'

জানি না এমন কতক্ষণ সে স্বগতোক্তি করেছিল আপন মনে। আমি তার এসব দুর্বোধ্য কথা-বার্তায় কান না দিয়ে বরং নাক ডেকে ঘুমাতে লাগলাম। আমার যখন ঘুম ভাঙ্গল, সকাল হয়ে গেছে। ঝুপড়ির বেড়ায় কঞ্চির ফাঁক দিয়ে লম্বমান একটা আলোকরশ্মি তীরের মতো এসে পড়েছে ছোট পরিসরে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। চেয়ে দেখি, আমার পাশের চাটাইতে ভগবান নেই—একটা বছর আটেকের নাদুস নুদুস ছেলে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কত সুন্দর তার ত্বক, কত সুন্দর তার চোখের পালক, কত মসৃণ তার ললাট। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে তার ছোট দেহটা মৃদু মৃদু দুলছিল।

এই ধরণীর শিশুদের দেখতে এসে ভগবানের পরদিনও কেটে গেল বোম্বেতে। আজ আমি মনোহর নামে একটা গুজরাটি ছেলের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। মনোহরের কাঠির মতো ছিল দেহখানি। কিন্তু কথায় ভীষণ তেজ ছিল। ক্ষুধার্ত চোখ দুটো তার সারাক্ষণ ধিকি ধিকি জ্বলছে। চোখে-মুখে সব সময় যেন একটা শিকারের অন্বেষা। দরজায় টোকা দিয়ে যখন সে আমাদের ঝুপড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং চাটাইতে দুটি সমবয়েসী শিশুকে দেখতে পেল, অনেকটা হোঁচট খাবার মতো সে আমতা আমতা করে বলল, 'এ

ছেলে, তোমার শেঠ কোথায় ?' আমাকে ইঙ্গিত করে বলল। আমাকে সে মোটেই চিনতে পারল না। কেন না, আমিও শিশুর বেশ ধারণ করেছি।'

আমি বললাম, 'শেঠ তো বাইরে।'

মনোহর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি শেঠের ছেলে মনে হচ্ছে ?'

আমি মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানালাম। মনোহর এবার ভগবানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও কে ?'

'ও একটি ছেলে, আমার সাথে আছে।'

মনোহর চুপসে গেল। কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, 'শোনো, শেঠকে বলো তার লটারীতে চৌকা এসেছে। টাকা ন'টা আমার কাছে, সন্ধ্যার দিকে এসে দিয়ে যাব।' বলেই আমার আপাদমস্তকটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'ধরবে নাকি তুমিও ? বড় মজার লটারী।'

'হ্যাঁ।' আমি সম্মতি দিলাম।

'কিসে ধরবে ?'

'তিন থেকে পাঞ্জা।'

'কত ধরবে ?'

'দু' আনার।'

বলতেই মনোহর একটা কাগজের টুকরা বের করে তাতে তা নোট করে নিল। আমি ভগবানের কাছ থেকে দু' আনা ধার নিয়ে তাকে দিলাম। মনোহর ভগবানের দিকে একবার তাকাল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এ ছাড়াও খেলবে নাকি ?'

'কিসের খেলা ?' ভগবান প্রশ্ন করল।

'লটারী।' মনোহর বলল।

'সেটা আবার কি ধরনের খেলা ?'

মনোহর তার দিকে তাচ্ছিল্য ভরে তাকাল। আমি তাকে বললাম, 'ও কালই গ্রাম থেকে এসেছে কিনা !'

মনোহর ভগবানের কাছ ঘেঁষে বসে পড়ল। এবং তাকে বুঝাতে

শুরু করল, 'লটারীতে ছটা নম্বর হয়ে থাকে। ওপেন টু ক্লোজ ধরা যায়। ওপেনও ধরা যায়। সন্ধ্যার দিকে যখন লটারী খোলা হবে তোমার নাম্বার যদি আসে, তাহলে তুমি টাকা প্রতি ন'টাকা পেয়ে যাবে।'

'এক টাকার বদলে ন'টাকা?' ভগবান বিস্ময় প্রকাশ করে।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এক পাপের বদলে একই পাপ, এক পুণ্যের বদলে একই পুণ্য হয়ে থাকে, কিন্তু.....'

'এসব পাপ-পুণ্য কি বলছে ছেলেটি?'

মনোহর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। আমি চট করে বললাম, 'গ্রাম থেকে এসেছে তো, এসব ওদিককার হিসেব।'

'আচ্ছা বুঝেছি। তো যা বলছিলাম, একের বদলে পাবে নয়। আর যদি না পাও, তাহলে মাত্র এক টাকাই গচ্চা যাবে।'

'বেশ তো মজার খেলা তাহলে এটা।' বলেই ভগবান উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'নাও, তাহলে এক্ষুণি আমি চার আনা ধরলাম।'

'নাও, তাহলে তাড়াতাড়ি ধর। আমার আবার হাতে সময় কম।'

'সময়ের কি কোন শেষ আছে?' ভগবান বলল।

মনোহর বলল, 'তোমার বন্ধুটি কিসব আজব ধরনের কথাবার্তা বলছে। সময়ের শেষ নেই মানে?'

'তুমি কোন স্কুলে পড়?'

'স্কুল? কিসের স্কুল? বি. এ. পাশ করে কত লোক ঘোড়ার ঘাস কাটে। কত লোক পোষ্টাফিসের বাইরে বসে মানুষের চিঠি লিখে রোজ দশ আনার বেশী কামাতে পারে না। অথচ আমি এই করে ভগবানের ইচ্ছায় দশ টাকা কামিয়ে থাকি। তাই পড়াশুনা করে কি হবে শুনি? যাক, লটারী খেলবে তো ঝটপট কর, নয়তো আমি চললাম। আমার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।'

মনোহর চলে গেলে ভগবান বলল, 'এই ছোকড়া লটারীর ধান্দা

করছে। বার বছর বয়স হয়েছে, অথচ পড়াশুনার নামটি নেই। এসব লটারী তো আসলে জুয়া খেলা।'

'বোম্বাই শহরের তিন-চতুর্থাংশ নাগরিক জুয়া খেলে থাকে। খেলায় জিতার আশা নিয়ে সকালকে সন্ধ্যা করে। শুধু আশার ছলনে ভুলি। তুমি কি এই আশার আনন্দটুকু তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও?'

'কিন্তু ওতো এখনো ছোট মানুষ। ওর অনাগত জীবনের সকল আশা-ভরসা এভাবে বিনষ্ট হবে কেন?'

'বোম্বাইতে হাজার হাজার শিশু এ করেই দিনাতিপাত করছে। রাস্তাঘাট, ষ্টেশন, বাজার, অলি-গলি—সর্বত্রই এরা বিচরণ করছে। যেখানেই যাবে এদের দেখা পাবে।'

'ওপেন টু ক্লোজ—মনোহর লটারীর ওপেন টু ক্লোজ অবধি ন'টাকা দিয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা ওপেন টু ক্লোজ—মানে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কি নিয়ে থাক? মারামারি, কাটাকাটি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য এবং হানাহানি নিয়েই তো তোমাদের জীবন।'

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'বুঝেছি, তোমার মেজাজটা ঠিক নেই। চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'চলো।' তারপর দিকচক্রবালের দিকে তাকিয়ে ভগবান বলল, 'আমি আজ সন্ধ্যার দিকেই স্বর্গে চলে যাব ভাবছি।'

ছয়

মহম এলাকায় খৃষ্টান ছেলেপিলেদের জমজমাট মেলা বসেছিল। সেণ্ট এণ্ড রিজ চার্চের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। রং-বেরং ফুলের সাজ চারদিকে। প্রাঙ্গণের এককোণে রয়েছে মাতা মেরীর আবক্ষ প্রস্তর মূর্তি। লোকেরা গড় হয়ে প্রণাম করছিলো একে একে। রং-বেরং-এর কাপড় পরিহিত ছেলে, বুড়ো এবং মহিলারা গির্জার ভেতরে যেয়ে মোম জ্বেলে আসছিল দলে দলে।

গির্জার কম্পাউণ্ডের বাইরে ছেলে-বুড়ো সবাই চড়ক গাছে চড়ে আনন্দ উপভোগ করছিল। নানাবর্ণের যিশু খ্রীষ্টের ছবি বেচাকেনা চলছিলো। গিল্টি করা সোনার সুদৃশ্য পুতুল, আমেরিকানদের তরী পাতলুন এবং অন্যান্য পরিচ্ছদের নকশী বোতাম, চকলেট, মিষ্টি, লিপষ্টিক, কাগজের ফুল, রেশমী রুমাল ইত্যাদিও বিক্রি হচ্ছিল। মোটকথা চারদিকে বেশ মনোমুগ্ধকর মেলা চলছিল। আনন্দ উচ্ছ্বাস আর হৈ-হুল্লোড়ে রীতিমত কানে তালা লাগার যোগাড়।

ভগবান একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রেখে এই মেলা অবলোকন করছিল। বহুক্ষণ ধরে এই রকমারী মেলা খুঁটে খুঁটে দেখছিল সে। সুন্দর সুন্দর ফুটফুটে শিশু, সুসজ্জিত পোশাক-আশাক আর মেলার রং-বেরং-এর আয়োজন দেখে ভগবানের মনটাও বেশ লাগছিল। বাহ্! কি সুন্দর শিশুরা আর ওদের মা-বাপ ভাই-বোনেরাও কত সুন্দর দেখতে! বেশ লাগছে। বিশ্বের সকল শিশুদেরই এমন হওয়া চাই। পুরো দুনিয়াটাই এই শিশুদের মতো হাস্যোজ্জ্বল হবে। এইটেই আমি চাই।

আমার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছিল। আমি গট গট করে চার প্লেট পানি পুরিগ লধঃকরণ করলাম। এর আগে ক'টা চকলেটও খেয়েছি। দু'পকেটে প্রচুর মিষ্টি ভরে নিয়ে ভগবানের এসব দার্শনিক উক্তিগুলো হাসিমুখে শুনছিলাম। মাঝখানে আমি ফোড়ন কেটে বললাম, 'এই জগতে জীবনের যে দর্শন তুমি পেশ করছ ছ'সাত বছরের শিশুদের থেকেই তুমি তা কেমন করে আশা করো? জানি না, তুমি কোন্ দুনিয়ার কথা বলছ?'

ভগবান অশ্রু ছল ছল চোখে তার সামনের অগণিত শুচিশুভ্র শিশুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমন শুচিশুভ্র সুন্দর আর সুসভ্য পরিবারের শিশুদের দেখার জন্যেই তো আমি স্বর্গ থেকে এসেছিলাম। এ রকম শিশুদেরকেই আমি দু'চোখ ভরে দেখবো, এই ছিল আমার কামনা।'

আমি বললাম, 'তাহলে এবার তোমার ইপ্সিত শিশুদের পেয়ে গেছ। দু'চোখ ভরে দেখেও নিয়েছ তাদের। এবার স্বস্তির নিঃশ্বাস টেনে তুমি

স্বর্গের দিকে রওনা দিতে পারো।'

'তা পারি বৈকি।'

'তা হ'লে চলো এবার আমরা ফিরে চলি। মনের ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেছে। এবার স্বর্গে যেয়ে তুমি ইচ্ছা মতো একটা চমকপ্রদ রিপোর্ট পেশ করতে পারবে।'

'তাতো বটে। আমি আশা করছি, আজ সন্ধ্যেতেই স্বর্গে রওনা হয়ে যাবো।'

সুশ্রী ও সুসজ্জিত শিশুদের উপর আর একবার নজর বুলিয়ে নিয়ে ভগবান বললো, 'তা'হলে চলো, মহমের বাস ষ্ট্যাণ্ডে যেয়ে তোমাকে বাসে তুলে দিই। তোমার পাড়ি তো বেশ লম্বা।'

'আচ্ছা চলো।' বলেই আমরা দু'জন কম্পাউণ্ডের বাইরে চলে এলাম।

বাইরে আসতেই সামনে পড়লো মোমবাতি বিক্রেতা একটা ছোট ছেলে। আমাদের দেখেই ছেলেটা পিছু নিল এবং বলতে লাগলো, 'আমি এতিম ছেলে···নেহাত এতিম···তিন আনায় দু'টো মোমবাতি বিক্রি করি। দয়া করে দু'টো মোমবাতি নিয়ে যাও। ক্রাইষ্ট তোমাদের মঙ্গল করবে···মাত্র তিন আনা···মাদার ফাদার ডেড···দয়া করে নিয়ে যাও।'

ছেলেটি আমাদের পিছে পিছে অনেকদূর এলো। ভগবান তার কথা শুনে প্রথমটায় গলে গিয়েছিল। হাত বাড়িয়ে দু'টো মোমবাতি নিতেও যাচ্ছিল। কিন্তু আমি বাধা দেওয়াতে আর নিলো না। কিন্তু দূর থেকে তার শান্ত স্নিগ্ধ স্বর ভেসে আসছিল। আর আকুলি বিকুলি শুনে আমার মনটাও গলে গেল। আমি বললাম, 'নিয়েই নাও দুটো মোমবাতি। মাত্র তিন আনার ব্যাপার। সারাক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান আর ভালো লাগে না।

ভগবান স্মিত হেসে আমার দিকে তাকালো।

পকেট থেকে তিন আনা বের করে ছেলেটিকে দিলো এবং দুটো মোম নিয়ে নিল।

ছেলেটি বলল, 'ক্রাইষ্ট, সেভ ইওর সোল।'

ছেলেটি তিন আনার বদলে মোফতে দু'টো দোয়াও করল।—'গড ব্লেস ইউ।'

পুওর অরফান, মাদার ফাদার ডেড—তিন আনায় দুটো দোয়া।

আমরা পায় পায় কিছুদূর এগিয়ে এলাম। চলতে চলতে আমি ভগবানকে বললাম, 'ক্রাইষ্ট, সেভ ইওর সোল। তোমার কোন সোল আছে, কোন আত্মা?'

'আমার আবার কিসের আত্মা? দুঃখ সুখ বলতে যার কিছু নেই, তার আত্মা থাকবে কোত্থেকে? আত্মা তো আমি তাদের দিয়েছি যারা দুঃখ-সুখ, হাসি-আনন্দ বহন করে চলে।'

'আচ্ছা ভগবান, স্বাদ, আয়ু এবং অনুভূতি—এগুলো আসলে কি?'

'শুধু একটা খেয়াল, একটা অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নয়।'

'লোকেরা তা'হলে কি শুধু একটা খেয়ালের বসে মোমবাতি জ্বালিয়ে থাকে?'

মোমবাতি কেন, একটা খেয়ালের বশে সারা জীবনটাই তো সে প্রজ্জ্বলিত করে রাখে।'

'তা তুমিই ভালো জানো।' আমি বললাম।

ভগবান বলল, 'একটা খেয়াল ছাড়া আর কি? একটা খেয়ালের জন্যেই তো মানুষকে কাঠের সাথে বেঁধে আগুন দিয়ে পোড়ায়, গভীর কবর খনন করে দেহটাকে পুঁতে দেয়, রেশমী দড়ি লাগিয়ে প্রাণবায়ু নির্গত করে, ক্রুশে বিদ্ধ করে মারে। কিন্তু তারপরও তো খেয়ালের শেষ নেই।'

সাত

পায় পায় আমরা বান্দ্রার বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। মনে হচ্ছিল আরো যদি ভাবতে যাই, পাছে দেহটা এখানে থেকে যাবে, আর আমি উড়ে যাবো নিসীম দিগন্তে। অতএব এসব রেখে বাসে উঠে বসাই শ্রেয় মনে করলাম আমরা দু'জনে। ডবল ডেকার বাস ছিল সেটা। আমরা সরাসরি দোতলায় যেয়ে বসলাম। উপরে বেশ বাতাস লাগছিল। উপর থেকে চারদিকের দৃশ্যও বেশ ছবির মতো মনে হচ্ছিল। আমরা দু'জন পাশাপাশি ঘেঁষে বসলাম। আমাদের ডান-দিকের সিটে একটি স্কুলগামী সুদর্শন এবং ভাল পোশাক-আশাক পরা ছেলে বসেছিল। কাঁধে ঝুলানো তার চামড়ার ব্যাগে এক গাদা বই রয়েছে। বাঁ হাতে একটা ছোট নোট বুক খাতা রয়েছে। বুক পকেটে একটা ফাউণ্টেন পেন রয়েছে। ছেলেটির আপাদমস্তক ইউনিফরম ছিল সাদা ধবধবে। বড্ড ভালো লাগছিল ছেলেটিকে আমার। আমরা বারবার ছেলেটির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম, কিন্তু ছেলেটি আমাদের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করলো না।

ইতিমধ্যে টিকিটের তাড়া এলো। ভগবান টিকেট কেনার জন্যে পকেটে হাত দিল। কিন্তু পকেটে হাত দিয়ে ভগবান একেবারে 'থ' বনে গেল। চোখ ছানাবড়া। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে?'

জবাব দিল, 'আমার পকেট সাফ।'

'কখন নিলো?'

'তা কেমন করে বলব?'

মানিব্যাগের বদলে ভগবানের হাতে একটা সাদা মোমবাতি। মোম-বাতি দেখিয়ে ভগবান বলল, 'সেই চার্চের ছেলেটির কাছ থেকে

মোমবাতি কেনার সময় পর্যন্ত তো আমার মানিব্যাগ ঠিকঠাক ছিল। তারপর আমরা বাস ষ্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। বাস ষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত তো আমাদের সাথে তৃতীয় কোন ব্যক্তির যোগাযোগ হয়নি। মনে হচ্ছে এই কেরামতি সেই গরীব ছেলেটির···যে নিজেকে পুওর অরফান বলে চেচাচ্ছিল ···মাদার ফাদার ডেড···' আমি জোরে জোরে হাসছিলাম।

'অথচ অশ্রুসিক্ত সেই ছেলেটিকে কত নিষ্পাপ এবং ভালো মনে হচ্ছিল।'

ভগবান চরম বিস্ময় প্রকাশ করে আবার বলল, 'হাঁ, চোখে জল ছিল আর হাতে ছিল কাঁচি।'

কণ্ডাক্টর হাকল, 'পয়সা বের করো।'

ভগবান মোমবাতিটা এগিয়ে দিয়ে বিনীতভাবে বলল, 'এটা নিয়ে নাও। এটা জ্বালালে তোমার আত্মা শান্তি পাবে। গীর্জা থেকে এনেছি।'

কণ্ডাক্টর বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'আত্মা শান্তি পাবে, কিন্তু চাকুরী তো চলে যাবে। জলদি জলদি পয়সা বের করো।'

'আমার কাছে তো পয়সা নেই। দয়া করে এমনি দুটো টিকিট দাও। আমি তোমাকে দোয়া করব। গড ব্লেস ইউ।' ভগবান বিনয় প্রকাশ করে আবার বলল।

কণ্ডাক্টর বলল, 'আবে ছোকড়া, আমার সাথে তামাসা হচ্ছে বুঝি? এক্ষুণি নিচে নামিয়ে পুলিশে দিয়ে দেব। পয়সা বের কর্। সাথে সাথে তুইও বার হ বাস থেকে।' বলেই বাস কণ্ডাক্টর এবার আমাকে ধরল।

আমি মুখ কাচুমাচু করে বললাম, 'আমার পয়সাও ওর কাছে ছিল। পকেট মার হয়ে গেছে, আমি কি করব?'

বাস কণ্ডাক্টর চরম বিরক্তি প্রকাশ করে ঘণ্টা বাজাল। বাস আস্তে আস্তে থামতে লাগল। বাস থামতে দেখে পাশের সাদা ইউনিফরম পরা ছেলেটি মুচকি হেসে বলল, 'তোমরা, দু'জন কোথায় যাবে?'

আমি বললাম, 'বাইকাল্লা ষ্ট্রিট।'

ছেলেটি বলল, 'আমিও ওখানেই নামবো। চলো আমি তোমাদের

পয়সা দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে নেমে তোমাদের বাসা থেকে আমার পয়সাটা দিয়ে দিও।'

ভগবান জবাবে একটা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি তাকে চোখে টিপ দিয়ে নিরস্ত করলাম।

সেই ছেলেটি যখন টিকেটের পয়সা দিচ্ছিল এমন সময় বাস মহম ষ্ট্যাণ্ডে এসে থামলো।

একজন পুলিশ দোতলায় উঠে এসে চারদিকে সন্দেহজনক দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছিল।

ভগবান জিজ্ঞেস করল, 'পুলিশ এভাবে কি দেখছে?'

ছেলেটি বলল, 'এখানে এলেই মদের জন্যে তল্লাশী হয়। বোম্বেতে মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কিনা।'

'তুমি কি বোম্বেতে নতুন এসেছ?' পুলিশটি ভগবানকে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' ভগবান জবাব দিল।

'তুমি যেখান থেকে এসেছ, সেখানে মদের করবার কেমন চলে?'

ভগবান বলল, 'বেশ চলে। সেখানে তো রীতিমতো মদের সরোবর রয়েছে।'

'তাহলে তো তোমাদের তল্লাশী নিতে হয়।'

বলেই পুলিশ আমাদের দুজনের তল্লাশী নিয়ে নিলো। স্কুলের ছেলেটি আমাদের দু'জনের ভাবসাব দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগল। পুলিশও ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হাসল। এরপর পুলিশটি চলে গেল। বাসও ষ্ট্যাণ্ড ত্যাগ করে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো।

ছেলেটি এবার উঠে এসে আমাদের সামনে বসল এবং ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমার পকেটে কত টাকা ছিল?'

'হিসাব তো ছিল না, তবে যা ছিল, সবই গেছে।'

'তবুও অনুমান করে বলো কত ছিল?'

'তা আমি কেমন করে বলব? বোম্বেতে যা কিছু নিয়ে এসেছিলাম

সবকিছু নিয়ে গেছে। একটা পাই পয়সাও আমার কাছে নেই।'

'এখানে কোথায় থাকো?'

'কোথাও থাকি না। এসেছিলাম এর কাছে। এর কাছেও কোন কাজ নেই।' ভগবান আমাকে দেখিয়ে বলল।

ছেলেটি আমার দিকে তাকালো।

আমি তাকে বললাম, 'মাষ্টার, আমরা তো রাস্তার ছেলেপিলে। কোন কাজ-কাম নেই। স্কুল-পাঠশালাতেও আমরা যাই না। এখন ধরে নিতে পারো, তোমার টিকেটের পয়সাটা মারা গেছে। বাইকাল্লাতে আমাদের কোন বাসা নেই। এখন সব জেনেশুনে পয়সাটি মাফ করে দিতে পারো, নয়তো পুলিশে দিয়ে দাও।'

ছেলেটি আমার কথা শুনে মিটি মিটি হাসতে লাগল। পকেট থেকে একটা সাদা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছে নিলো ইতিমধ্যে। সম্ভবতঃ এ ধরনের কথাবার্তা সে জীবনে প্রথমবার শুনলো। কেননা, ছেলেটি সত্যিই উঁচু ধরনের কোন অভিজাত পরিবারের ছেলে। আমাদের দুরবস্থা দেখে নিজের পয়সা দিয়ে টিকেট কিনে দিয়েছিল। কিন্তু···

বাইকাল্লা ব্রিজের কাছে বাস থামতেই ছেলেটি নামতে উদ্যত হলো এবং বলল, 'তোমরা যদি আমার পয়সাটা না দিতে পারো তাহলে আমার ব্যাগটা কিছুদূর বহন করে নিয়ে দিতে হবে।'

'কদ্দূর?'

'বাসা পর্যন্ত।'

আট

ভগবান চামড়ার ব্যাগটা বগলে নিয়ে ছেলেটিকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। আমিও তাদের পেছনে চলতে লাগলাম। সামনে ট্রামের লাইন পেরিয়ে আমরা এক থমথমে গলিতে ঢুকে পড়লাম। তারপর অন্য আরেক গলিতে। তারপর তৃতীয় গলি অতিক্রম করে কতকগুলো

কাঠের গুড়ির স্তূপের কাছে যেয়ে আমরা উপনীত হলাম। কাঠের স্তূপের উপর ময়লা টুপি, ময়লা গেঞ্জি এবং ময়লা লুঙ্গি পরিহিত একটি বখাটে ছেলে বসেছিল। বয়েস সতের-আঠার বছরের কাছাকাছি হবে। তার মুখাবয়ব কালো এবং সবুজ মিশ্রিত রং-এর সমন্বিত একটা রূপ বলে মনে হলো। গায়ের রংটা শ্যামলা। চেহারা বদসুরত এবং মুখভর্তি কালো কালো দাগ। কালো লুঙ্গির ভেতরে হাত ঢুকিয়ে গা খুজলাতে খুজলাতে আমাদের সঙ্গের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা ?'

'আমার বন্ধু।'

'সত্যিকার বন্ধু, না বাটপার ?'

'নেহাত গরীব, কোন কাজটাজ নেই এদের হাতে।'

'কি কাজ করবে ?' ময়লা কাপড় পরিহিত ছেলেটি আমাদের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল।

'কাজ পেলে তো করব।' আমি বললাম।

জবাবে সে কিছু বলল না। চামড়ার ব্যাগওয়ালা ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এনেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'কৈ, বের করো।'

ছেলেটি তার চামড়ার ব্যাগ থেকে তিনটি বোতল বের করল। বলা বাহুল্য, বোতল তিনটি ছিল মদের। ছেলেটির ব্যাগে কোন বই ছিল না। স্কুলের ছেলের ছদ্মবেশে অবশেষে·····

ভগবান বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। ভগবান বলল, 'আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি স্কুলের ছাত্র।'

'হাকুকে এখনো চেননি তোমরা !' বলেই সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

আবার বলল, 'আমি তো ভাই মদের স্কুলের ছাত্র। দশ বছর থেকে আমি এই পেশা করে আসছি। এখন তো স্কুল পাশ করে হুইস্কির কলেজে ঢুকেছি।'

হাকু এবার ময়লা কাপড় পরিহিত ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবা কোথায় ?'

'খেতে চলে গেছে। আমাকে বলে দিয়েছে, হাকু এলে পয়সা দিয়ে বোতলগুলো নিয়ে নিবি। আর শালা তুমি কিনা এতো দেরী করে এলে!'

'নাও, টাকা বের করো।' হাকু বলল।

'এত তাড়াহুড়া কেন, এক পেগ আগে গলাতে ঢেলে নিই·····' বলেই ময়লা কাপড় পরিহিত ছেলেটি কাঠের গুড়ির পেছন দিক থেকে গোটা চারেক গ্লাস বের করে নিয়ে এলো।

ভগবান বলল, 'তোমরা এত ছোট, অথচ মদপান করছ দিব্যি। এমনটি তো আর দেখিনি।'

হাকু খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, 'এতে এমন দোষ কি? মদের কারবারই যখন করছি, মদকে ভয় পেলে তো চলবে না। যব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া? নাও, তোমরাও একটু টেস্ করে দেখো।'

বড় ছেলেটি চারটি গ্লাসেই মদ ঢেলে নিলো। মদ ঢেলে বোতলটির বাকী মদটুকুর সাথে পানি মিশিয়ে নিয়ে মুখ বন্ধ করে বলল, 'এবারে আমার বাবা শালা একটুও টের পাবে না যে, মাঝখানে আমরা এই কারবারটা করেছি। নাও, নাও, তোমরা তাড়াতাড়ি গ্লাস খালি করে দাও। বাবা এসে পড়ল বলে। বাবা যদি দেখেই ফেলে, তাহলে মারতে মারতে প্লাষ্টার করে ফেলবে।'

হাকু এবং সেই ছেলেটি গট গট করে পান করছিল। আমরা একটা মোক্ষম সুযোগ মনে করে এই ফাঁকে কেটে পড়লাম। আমাদের কেটে পড়তে দেখে ওরা হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। ওরা আমাদের পিছু নিল না। কোনরকম বাঁধাও দিল না। ওরা আমাদেরকে আস্ত বোকা বলেই মনে করল।

বাইকাল্লা পুলের কাছে পৌঁছে আমরা পদব্রজে দাদর পুলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমি ভগবানকে বললাম, 'এবার কোথায় যাবে?'

'কেন, তোমার বাসায়।'

'কিন্তু তোমার তো আজ ফিরে যাবার কথা ছিল।'

'আপাততঃ স্থগিত রাখলাম।'

'কেন, হাকুকে দেখে?'

ভগবান প্রতি উত্তরে কিছু বলল না। আমি চেয়ে দেখলাম, ভগবানের চোখ দুটো অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হয়ে এসেছে।

আমি ভগবানকে বলতে চেয়েছিলাম, ভগবান তোমার মত ভাল মানুষটি আর হয় না, তোমার মতো সংবেদনশীল, উদার এবং নিষ্পাপ মন আর দেখিনি। কিন্তু চোখের জলে যদি এই সমাজ বদলে যেতে পারতো তাহলে প্রতি ভোরে শিশিরের অশ্রু দুর্বা ঘাসে ঘুমিয়ে থাকতো না।

সে রাতে খোলার ঘরে বড্ড গরম এবং ক্ষুধা-তেষ্টায় আমি রীতিমত ঘেমে উঠেছিলাম।

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবানকে বললাম, 'তুমি কেন যে আমার কাছে এলে? এই শহরে শত শত লক্ষপতি ব্যবসায়ী, কোটিপতি ঠিকাদার এবং মিল মালিকরা রয়েছে। তারা তোমাকে পেলে আদর-যত্ন করে রাখতো। কোন কষ্ট হতো না তোমার সেখানে। কিন্তু তুমি জেনেশুনে আমার কাছে কেন কষ্ট করতে এলে?'

ভগবান বলল, 'আমি ভগবান, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি। তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। তোমার তো শোকরিয়া আদায় করা দরকার যে, আমি অন্য কারো কাছে না যেয়ে তোমার ঝুপড়িতে এসেছি। অথচ তুমি উল্টা আমাকে শাসাচ্ছ।'

'না শাসিয়ে কি করব? সেই সকাল থেকে উপোস করে আছি। খৃষ্টানদের গির্জাতে সেই যে একটু মিষ্টি খেয়েছি, তারপর থেকে এখন পর্যন্ত একটু চা পর্যন্ত পেটে পড়েনি। দিন ভর তোমার সাথে পই পই করে ঘুরলাম আর তুমি কিনা কোন পকেটমারের দ্বারা তোমার পকেটটা সাফ করিয়ে নিয়ে আমার উপর চড়াও হয়েছ।'

ভগবান বলল, 'তোমার যে ক্ষুধা পেয়েছে সেটা আমি টের পেয়েছি।'

আমি রেগেমেগে বললাম, 'আমি তো আর তোমার মতো ভগবান

নই যে, আমার ক্ষুধা লাগবে না।'

ভগবান চুপসে গেলো।

আমি বললাম, 'চুপ করে কেন রয়েছ? আমাদের জন্ম দিয়েছ, আমাদের বেঁচে থাকার উপকরণ কেন দাওনি। এই কি আমাদের কপালে ছিল, এই খোলার ঘরে জ্বলে-পুড়ে হা-পিত্যেশ করে মরব? যাও তোমার স্বর্গে তুমি চলে যাও। সেখানে গিয়ে অন্ততঃ আমাদের মতো এই গরীবদের একটা মরার উপায় করো যেন।'

ভগবান বলল, 'আমার তো এখনো যাবার সময় হয়নি। আমি যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে এসেছি, সে উদ্দেশ্য এখনো আমার পুরো হয়নি।'

'তাতো বুঝলাম। এখন পয়সা বের করো। আমি যদি আজ অন্য কোথাও গতর খাটাতাম তাহলে সারা দিনে দু'বারও কি আমাকে খাবার দিত না?'

আমার কাছে তো পয়সা নেই, তুমিতো জানো—সেই দুটো মোমবাতি ছাড়া আর কিছু নেই আমার কাছে। মোমবাতিতে তো আর পেট ভরবে না।'

'ভগবানজী, তুমিও তো আজেবাজে লোকের মত আজেবাজে বকছ।'

'তাহলে আমি কি করব?

'কি করবে তা আমি জানি না। আমার সাংঘাতিক ক্ষুধা পেয়েছে। তুমি স্বর্গ থেকে পয়সা আনিয়ে নাও।'

'স্বর্গ থেকে কেউ পয়সা পাঠাবে না।'

'কেন, কার হুকুমে তারা পাঠাবে না?'

'আমার হুকুমেই তারা পাঠাবে না, সকল আইন-কানুন আমি নিজেই তৈরী করেছি, এখন নিজেই আমি কেমন করে সেসব আইন-কানুন ভঙ্গ করব?'

'তুমি দেখছি আজব ধরনের জীব। সারা বোম্বাই শহরে তুমি একমাত্র আমাকেই দেখলে! বিরক্ত করবার আর মানুষ পেলে না, ফিল্মষ্টার ভাগ কাপুর রয়েছে ইঁদুর শাহ কলন্দরের মুরীদ। দিনে

দু'বার মাজারে না গিয়ে স্যুটিং করতে যায় না। চার লাখ টাকা ব্লাকে নেয়। কন্ট্রাক্টে থাকে মাত্র পঁচিশ হাজার। তার বাড়ির গেটের তোরণ ইয়া বড়। তুমি তার কাছেও তো যেতে পারতে।'

'একবার আমি তার হৃদয়ের ঘ্রাণ নিয়ে দেখেছি, তাতে কোন গন্ধ নেই।'

'তাহলে হাপুরজী কাপুরজী দালানের সেই বাড়িতেও তো যেতে পারতে। আমি তাদের সবকিছু জানি। মিডল ইষ্ট থেকে ষাট টাকা দামে প্রতি তোলা সোনা স্মাগল করে কিনে এখানে এনে একশ' পঁচিশ টাকায় বিক্রি করে দেয়। প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সোনা স্মাগল করে থাকে। সরকারের বড় বড় ঠিকাদারী কাজে দাও মারে। তবে খুবই দানশীল এবং পুণ্যবান ব্যক্তি। এ বছরেই সে দুটো মন্দির, দুটো মসজিদ এবং দুটো গুরুদ্বার নিজের পকেটের চাঁদা থেকে তৈরী করেছে। তুমি তার কাছে গেলেই ভালো করতে।

ভগবান বলল, 'আমি লোকটির দুটো চোখ দেখেছি। তার চোখে কোন লজ্জা-শরম নেই।'

নয়

'তুমি এখানে না এসে আমা পুচকারণীর মহলে গিয়েও উঠতে পারতে। বোম্বের সবচাইতে বড় কাহবাখানা। আমা পুচকারণী গোটা পঞ্চাশেক কাহবাখানার (কাফেখানা) মালিক। এসব কাহবাখানাগুলোতে একরাতে যে আমদানী হয়, চিচামল কারখানার দেড় হাজার মজদুরের ত্রিশ দিনের উপার্জনের চাইতে অনেক বেশী। পুচকারণী প্রতিদিন দু'বার করে পূজা করে এবং দু'ঘণ্টা ধরে তোমার চরণে পড়ে থাকে।'

ভগবান বলল, 'আমি তারও বুকে কান পেতে শুনেছি, তার বুকে কোন নিষ্পাপ শিশুর কলধ্বনি শুনতে পাইনি।'

'তাহলে তুমি পীর কেরামত আলীর দরবারেও যেতে পারতে।

বোম্বের সবচাইতে বড় আধ্যাত্মিক পীর সে। সব সময় মোরাকাবায় পড়ে থাকে।'

'তাও জানি, কিন্তু খয়রাতি পয়সায় তার জীবন চলে।'

'তাহলে রামু ধোপা ?'

'সে নিত্য তার বউকে মারপিট করে।'

'তা না হলে আমাদের পাশের বাসার কেরানীর বাসা·····?'

'আমি তার নাক পসন্দ করি না।'

ভগবানের কথা শুনে আমি আর না হেসে পারলাম না। ভগবানও হেসে উঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মনের পুঞ্জীভূত ক্রোধটা মাটি হয়ে গেল। আমি বললাম, 'তুমি জাতে হলে ভগবান, তোমার আবার পসন্দ অপসন্দ'···

'এরা তো আমারই তৈরী। আমার সৃষ্ট জীবের উপর আমিই বা হাসি কেমন করে ?' ভগবান মুচকি হেসে বলল।

আমি বললাম, 'বেশতো কথা হলো, এখন এটাতো বোঝ, হাসাহাসি যতই করি না কেন, তাতে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, ক্ষুধা বরং বেড়ে যায়।'

'মনে হচ্ছে, এবারে আমার ক্ষুধা পাচ্ছে।'

'তোমার ক্ষুধা পাচ্ছে, তার মানে ?'

'সম্ভবতঃ পৃথিবীর নিয়মে আমি সংক্রমিত হয়ে পড়েছি।'

আমি একটু চিন্তা করে বললাম, 'আমার এক বন্ধু আছে, নাম তার ঘিনু। আদিবাস ছিল আজমগড়ে। ধুতি পড়ে। লম্বা টিকি রাখে। দিনভর গোয়ালগিরি করে, রাতের বেলা মদের ধান্ধা করে। তার কাছে গেলে খাবার তো পাবেই, তদুপরি দু'এক পেগও·····তবে মহম অবধি পায়ে হেঁটে যেতে হবে।'

'চলো, তাই চলো।'

'কিন্তু সে যদি পীড়াপীড়ি করে, দু'এক পেগ নিতে হবে কিন্তু।'

'তা নোব।'

'যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পুলিশ এসে পাকড়াও করে তাহলে তোমাকেই জেলে যেতে হবে।'

'তা যাব। তাতে এমন দোষের কি?'

'ভালভাবে ভেবে-চিন্তে দেখো। পরে আমাকে কিন্তু দোষারোপ করতে পারবে না। পরদিন যখন খবরের কাগজে বের হবে যে, ভগবান জেলে, তখন তোমার লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না?'

'লজ্জায় মাথা কাটা যাবার বাকী আছে কোথায়? বোম্বে শহরের এই যে শত শত মন্দিরের মাঝে আমার মূর্তিকে লোহার গরাদের মাঝে বন্দী করে রেখেছে, তাতে আমার লজ্জা হতে কি বাকী আছে?'

ভগবান অনেকটা আক্ষেপের সুরে বলল। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার জন্যে চপ্পল খুঁজতে লাগলাম।

মহমক্রেক। এখানে বছরে দু' দু'বার 'দি গ্রেট রয়াল সার্কাসের' শামীয়ানা টানানো থাকে। শামীয়ানার কাছেই ঘিনুর ঝুপড়ি। প্রকৃত পক্ষে তার বাসাবাড়ি গোর গাঁয়ে। কিন্তু সেখানে থেকে তো ধান্ধা-বাজী করা যায় না। অতএব সে পুলিশের ক্যাম্পের কাছে এই ডেরা বানিয়ে নিয়েছে। পুলিশের কাছে থাকলে সাহসটা বাড়ে।

ঘিনুর সাথে আমার দেখা হয়নি বেশ অনেকদিন হয়ে গেছে। এজন্যে আমাকে দেখেই সে খুশীতে বাগ বাগ। ওর মধ্যে একটা গুণ ছিল, সে মুখ দেখে সহজেই মানুষের মন বুঝতে পারতো। পেটে দানা-পানি পরেনি বুঝতে পেরে, অন্য কথা রেখে প্রথমেই সে আমাদের দু'জনের সামনে দু'পেগ রেখে দিল। সাথে সাথে রুটি এবং তেলে ভাজা দু'টো মাছের টুকরাও দিল। তারপর বলল, 'ঝটপট আগে মুখে তুলে নাও। খুব ক্ষুধা পেয়েছে তোমাদের, বুঝতে পেরেছি। কিছুক্ষণ পর আরো খাবার আনিয়ে দেব। ভগবানের ইচ্ছায় আমার কারবার আজকাল ভালই চলছে। যেমন দুধ বিক্রি হচ্ছে, তেমনি তোমার এই পানি…'

ঘিনু এ কথা বলেই নিজের টিকিটায় একটা গিরা দিয়ে গুছিয়ে নিল। তারপর ভগবানের একটা প্রতিকৃতির সামনে গড় হয়ে প্রণাম করল।

দশ

বস্তি এলাকা। এখানে দিনভর খেটে খাওয়া মানুষের ভীড়ে কুলি, মজুর, বড়লোকদের বাসার চাকর-নফর, ভিক্ষাবৃত্তি যাদের পেশা, রাত দশটার পরে দেহ ব্যবসায় মেতে ওঠে এমন সব মেয়ে এবং আরো অনেক ধরনের সামাজিক জীবদের নিয়ে এই বস্তি এলাকা। এখানকার আলাপ-সালাপের ধরন অন্য রকম। গাল-মন্দ আর তুই-তুকারী এখানে লেগেই থাকে। এখানে তামাকের গন্ধের সাথে মাছের, তাড়ি আর অপরিচ্ছন্ন মানুষের দেহের ভোটকা গন্ধে দম আটকে যাবার মতো পরিবেশ। ভগবান আস্তে আস্তে বলল, 'মানুষ নরকের চাইতে অসহ্য নিবাস তৈরী করেছে নিজেদের জন্যে, আর তা হলো এই বস্তি।'

আমি বললাম, 'তাহলে এটাতো মেনে নিচ্ছ যে, আমরাও এমন একটা কিছু তৈরী করতে পারি যা তোমার নরকের চাইতেও অধম।'

'হাঁ, তা মানতে হয় বৈকি।'

'তাহলে এটাও তোমাকে মানতে হবে যে, মানুষ যদি আবার এর বিপরীত দিকে ঝুঁকে যায় তাহলে তোমার স্বর্গের চাইতেও চমৎকার একটা কিছু করতে পারে।'

ভগবান আমার কথা শুনে বলল, 'রাখো ওসব পাকামো। হাতে যা আছে, ওটা শেষ করো।'

এক দালাল অন্য দালালকে বলছিল ঃ

'আমি লোকটাকে দেঁতোকুন্তীর (বেশ্যা) কাছে নিয়ে গেলাম। কুন্তীর সে দাঁত আর নেই। সে সম্পূর্ণ নতুন এক পাটি দাঁত লাগিয়েছে! কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটিকে তার পছন্দ হলো না। বলল, আমার জাপানী মেয়ে চাই। আমি তাকে এখানে নিয়ে এলাম। রাত তখন বারটা। আর যাবে কোথা শালা। আমি ঘিনুর এখানে এনে পেটপুরে মদ খাইয়ে নিলাম। শালা যখন একেবারে মাতাল হয়ে গেল, আমি তাকে আবার

কুন্তীর কাছেই নিয়ে গেলাম। এবারে সে কুন্তীকে পরখ করতে পারলো না। বলল, 'হাঁ, এ রকম জাপানী মেয়েই আমার চাই।' শালা জাপানী কা বাচ্চা। এক ঘণ্টা পূর্বে যে মেয়েকে সে দশ টাকা দিতে রাজী হতো না, এ যাত্রা সে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেল। ঘিনুর মদ এখানে আসল, আর সব নকল।' ঘিনু নিজেও এক পেগ মুখে তুলে নিয়ে এ কথা বলল।

ঘিনুর এক বন্ধু ছিল। নাম তার চিমটা রাম। সেও ঘিনুর মত দুধ বেচতো। সে ঘিনুর ব্যবসা জমে উঠেছে দেখে ঈর্ষা করে বলল, 'তোর ব্যবসা তো বেশ জমেছে, এরপর আমাকেও ধান্ধায় নামতে হবে।'

ঘিনু তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'না, না, এমন কাজও করো না। দুধের ব্যবসা এটার চাইতে অনেক ভালো। দুধে যত পানি দাও গাহাক কিছুই বলতে সাহস পাবে না। কিন্তু মদে এতটুকু পানি মিশালেও গাহাক টের পেয়ে গেলে আর এ-মুখো হবে না কোনদিন।'

'ঘিনু জিন্দাবাদ!' কে একজন চাকর পাশ থেকে বলে উঠল।

'সবই ভগবানের ইচ্ছা।' ঘিনু শিবের মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল।

ঘিনু সত্যি বড় ধর্মপ্রাণ লোক। সে তার বস্তির ঝুপড়ির চারদিকই দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে সাজিয়েছে।

কে একজন মজুর ফোড়ন কেটে বলল, 'ভগবান বলতে আছে নাকি কিছু? সামনের ওই মিলটাতে আগুন লেগে গেল। মিল এখনও চালু হয়নি। দু'মাস ধরে বেকার অপেক্ষা করছিলাম। আমার বউতো গত বিশ বছর যাবত রোজ মন্দিরে আসা-যাওয়া করে। অবশেষে আমাদের ভাগ্যে কি এ-ই ছিল?'

ঘিনু রেগে বলল, 'ভগবানকে উদ্দেশ্য করে কোন গালাগাল দেবে না বলছি। আমার এখানে যদি মদ খেতে চাওতো গালি চলবে না।'

মজুর তেড়ে উঠে বলল, 'এরপর তোমার এখানে আর আসছি থোড়াই। আমার মনের খবর তুমি কি জানো! আমি ভগবানকে এসব শোনাচ্ছি। ভগবান আমাদের মিলই যদি চলতে না দিলো তো আমাদের সৃষ্টি করে কেন পাঠাল এই ধরা ধামে?'

বলেই সে রাগে গড় গড় করতে করতে চলে গেল। কিন্তু সে তার কথায় একটা মোক্ষম প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে গেল চারদিকে। অন্যান্য লোকরাও বলে উঠলো, 'বেচারা তো সত্যি কথা বলছে। আমাদের এসব কারচুপি আর কদ্দিন চলবে?'

আর একজন বলে উঠল, 'সিন্ধি শেঠ আমাকে এক মাসের নোটিশ দিয়েছে। বাড়ি খালি করে দাও। বাড়ি কিভাবে খালি করব? কোথায় যেয়ে উঠব যে, ঘর খালি করব?'

অন্য একজন বলে উঠল, 'সবাই বলে তুমি চোর। বান্দ্রার বাজারে টমাটো আট আনায় পাওয়া যায় আর তুমি কিনা হাকাচ্ছ বার আনা। অথচ আমি তোমাদের বলতে পারি, যদি এক শব্দ মিথ্যা বলি তবে নিজের মাংস খাই! আমি এক পয়সা চুরি করি না, অথচ রোজ আমাকে চোর শব্দ শুনতে হয়। সত্যি ভগবানের হাতে কোন ইনসাফ নেই।'

অন্য আরেকটি সংলাপ ঃ

'আমার ছেলের অসুখ ছিল। শাহ বরকত পীরের দোয়ায় ভাল হয়ে গেল। সত্যি ভগবান বড় মহান।'

অন্য একজনের কথা ঃ

'সত্যি বড় মহান সে, সত্যি বড়.....'

'সত্যি বড় নিষ্ঠুর সে...সত্যি...।'

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

দুষ্প্রাপ্য বই/ Rare Collection

এগার

এভাবে দুই মাতালের মাঝে বাক-বিতণ্ডা চলছিল। দু'জনই বেশ গাট্টা-গোট্টা জওয়ান। ভগবানের গুণ কীর্তন করার চাইতে নিজেদের শক্তি প্রদর্শনই যেন তাদের বাক-বিতণ্ডার আসল উদ্দেশ্য।

'আমি বলছি তার চাইতে কেউ বড় নেই এ সংসারে।'

'আমি বলছি তার চাইতে মহান কেউ নেই।'

'বড়।'

বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

'না, মহান।' বলেই দু'জন সামনা-সামনি উঠে দাঁড়াল এবং দু'জন দু'জনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে হাত-পা গুটাচ্ছিল, এমন সময় ঘিনু এসে দু'জনের মাঝে দাঁড়াল।

'এই হাতাহাতি করবি না বলছি। অন্য একজনকে ডেকে এর ফয়সালা করতে হবে।'

'ঠিক আছে, তাই হোক।'

দু'জনই সমস্বরে বলে উঠল। তারপর দু'জনের দৃষ্টি নিপতিত হলো আমাদের দু'জনের উপর। আমাদের টেবিলটা কাছেই ছিল। তারা ভগবানের বার বার আপাদমস্তক দেখছিল। কারণ, আমার চাইতে ভগবানের চেহারা অপেক্ষাকৃত ছিমছাম এবং নিষ্পাপ ধরনের। কি মনে করে তারা দু'জন আমাকে রেখে ভগবানের কাছে এসে বসল।

'তুমিই বলো, এ লোকটি বলছে ভগবান নাকি মহান, আমি বলছি নিষ্ঠুর। তুমিই বলো আমাদের মধ্যে কার কথা ঠিক?'

ভগবান বলল, 'কারো কথাই ঠিক নয়।'

'তা কেমন করে?'

'যেহেতু ভগবানের কোন অস্তিত্ব নেই।'

'একি বলছ? আরে শুনছ, শালা বলছে কিনা ভগবান নেই।'

'রাম রাম!'

'শালা নাস্তিক।'

'কি বলছিলে, ভগবান নেই?' বলেই ঘিনু ভগবানের কলার চেপে ধরল। 'যার কৃপায় বেঁচে বর্তে আছ, যার খাচ্ছ তাকেই কিনা গালি দিচ্ছ। তোমার সাহস কি, আমাদের ভগবানকে অস্বীকার করছ।' বলেই ঘিনু ভগবানের মুখে এক চড় কষিয়ে দিল।

আমি ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলাম, দৌড়ে এসে বললাম, 'আরে রাখো, একি করছ? তোমরা জান না, কার সাথে কি করছ? তাড়াতাড়ি ছেড়ে দাও.....'

'কেন ছাড়ব, শালা কিনা আমাদের ভগবানকে অস্বীকার করছে। শালার বুকে চাকু বসিয়ে দোব, তবে ছাড়ব।' বলেই তারা ভগবানকে

আর এক দফা ধোলাই করল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের হুইসেল শোনা গেল। লোকেরা দিক-বিদিক ছুটতে লাগল। আমি ভগবানকে টেনে হিঁচড়ে ঝুপড়ির ভেতর থেকে বাইরে নিয়ে এলাম এবং দৌড়াতে দৌড়াতে মহমের কাছে চলে এলাম। ভগবানের মুখে এবং গায়ে নানা ক্ষত দেখা গেল। দু'এক জায়গা থেকে রক্তও ঝরছিল। আমি পানি এনে তার ক্ষতগুলো ধুতে লাগলাম।

এখান থেকে ঘিনুর আড্ডা পুরোপুরি দেখা যাচ্ছিল। পুলিশের লোকেরা ঘিনু এবং অন্যান্য ক'জন লোককে ধরে নিয়ে গেলো। তারপর চারদিকে নিথর নীরবতা।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এলে আমরা পায় পায় বাসার দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম। পথ চলতে চলতে আমি ভগবানকে বললাম, 'তোমার আবার মাথায় কি পাগলামী চেপেছিল? নিজের অস্তিত্ব অস্বীকার করে মারটা খেলে। তুমি জান না এটা হিন্দুস্থান? এখানে প্রতি গলিতে মসজিদ, মন্দির, গুরুদ্বার, গীর্জা রয়েছে। আমরা ভগবানের বড় উপাসক। আমরা ভগবানের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।'

ভগবান বলল, 'মিথ্যে কথা, নিজের প্রাণ দিতে পার না। অবশ্য ভগবানের নামে অপরের প্রাণ সংহার করতে পারো। তুমি মনে করছ আমার দেহের এ ক্ষত কত যন্ত্রণা দিচ্ছে। আসলে এগুলো তোমাদের ক্ষত। কানপুর থেকে কোলকাতা আর জম্মু থেকে জব্বলপুর পর্যন্ত ধর্ম-কর্মের নামে এখানে যা কিছু হচ্ছে, সবই আমার নখ-দর্পণে রয়েছে। তোমরা কোনদিন হিসেব করে দেখেছ আমার জন্যে, শুধু আমার জন্যে তোমরা কত ক্ষতের সৃষ্টি করেছ?'

বার

সাত সকালে আমার চোখ খুলতেই দেখি ভগবান লাপাত্তা। আমি ভাবলাম, রাতের ঘটনা থেকে সে মনক্ষুন্ন হয়ে চলে গেছে। কিন্তু তাই বলে একটু বলে গেলে এমন ক্ষতি ছিল কি? আমি কি আর তার সাথে স্বর্গে যাবার বায়না ধরতাম? আবার মনে হলো, হয়ত বা ঘুম থেকে উঠেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে। দেখি, সূর্য উঠে নিক, ততক্ষণ অপেক্ষা করি। রাতভর আমার তেমন ঘুম হয়নি। এজন্যে পাশ বদল করে আবার শুয়ে পড়লাম। আমি পাশ ফিরে শু'তে শু'তে দেখলাম দরজা ভেজানো আছে। এমন কি দরজার অর্গলও খোলা নেই। তবুও এতে আমি তেমন বিস্মিত হলাম না। কেননা, রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে ভগবানের পক্ষে হাওয়া হয়ে যাওয়া তেমন আর বিচিত্র কিছু না। বরং এভাবে বন্ধ কামরা থেকে পালিয়ে যাওয়াই তার অনেকটা অভ্যেস বলা যেতে পারে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ভগবানের ভূমিকা অনেকটা এ ধরনেরই পরিলক্ষিত হয়েছে। মানুষকে বিপদে ফেলে ভগবান হঠাৎ এভাবে পালিয়ে যেতে অভ্যস্ত। এজন্যে আমি এ ব্যাপারে তেমন বিস্ময় প্রকাশ না করে ভালো মানুষটির মতো আবার শুয়ে পড়লাম। এরপর দ্বিতীয়বার যখন জাগলাম, প্রথমে দৃষ্টি পড়ল পাশের জায়গাটিতে, যেখানে ভগবান শুয়েছিল। এখন বেড়ার ফাঁক দিয়ে সূর্যের তীর্যক আলো এসে লুটিয়ে পড়েছে সেখানে সোনালী আখর রচনা করে।

চারদিকে আরেকবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। এবার আমি নিশ্চিত হলাম যে, ভগবান সত্যি সত্যিই চলে গেছে। ভগবান চলে গেছে এ কথা মনে হতেই আমি চারদিকে সন্দেহের চোখে নজর বুলালাম, সব জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে তো? অবশ্য ভগবান সম্পর্কে আমার এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা একটা বিরাট রকমের ধৃষ্টতারই শামিল। তাছাড়া আমার কামরার ভেতরে উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু ছিলও না।

যা ছিল হাতে গোণা ক'টা বস্তু। তবু এই বোম্বে শহরে কনফিডেন্স ট্রিক করার মতো লোকের তো কোন অভাব নেই। এমনও হতে পারে কোন সত্যিকার চোর-বদমাশ ভগবানের রূপ ধরে আমাকে বোকা বানিয়ে গেল। তাই আমি আরেকবার সবকিছু তদন্ত করে দেখলাম। একটা ছড়ি ছাড়া আর সবকিছু ঠিকঠাক আছে বলে মনে হলো।

এরপর প্রথমতঃ আমি একটা সান্ত্বনা পেলাম, কিন্তু পরমুহূর্তে লজ্জিত হলাম।। জানি না ভগবানের এমন কি প্রয়োজন পড়লো যে, আমার ছড়িটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

এসব আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে আমি যখন দ্বিতীয়বার বিছানার দিকে তাকালাম মনে হলো, কে যেন সবেমাত্র আবার পাশ ফিরে শু'লো। চেয়ে দেখলাম, ভগবান শুয়ে আছে। ছড়িটিও যথাস্থানে আবার রয়েছে। দরজার অর্গল যেমন ছিল তেমনি রয়েছে। ভগবানের এ ধরনের দুষ্টুমীতে আমার ভীষণ রাগ হলো।

আমি তার গা ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে বললাম, 'কোথায় গিয়েছিলে মরতে?'

বলল, 'মিস আশারাণীর কাছে গিয়েছিলাম।'

আমি বললাম, 'কোন্ আশারাণী? বিখ্যাত চিত্র নায়িকা আশা রাণীর কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

আমি বললাম, 'তোমার কাছে তো আশারাণীর কোন কাজ থাকার কথা নয়। ভগবান তো তাকে সবকিছুই দিয়ে রেখেছে। ধন, দৌলত, যশ, খ্যাতি—কোনটারই তো তার অভাব নেই। সর্বোপরি একজন বোকা স্বামীও রয়েছে তার। এ জগতে একজন মেয়ে যা চায় তার সবই রয়েছে তার কাছে। তুমি কি আশারাণীর বাড়ির ভেতরকার সুইমিং পুল দেখেছো?'

ভগবান মুচকি হেসে বলল, 'সেই সুইমিং পুল থেকে স্নান সেরে

সবে ফিরলাম। জানো, আমাদের স্বর্গে অমৃতের সরোবর রয়েছে। সেই সরোবর পদ্মফুল সুশোভিত। কিন্তু এমন সুগন্ধি স্বচ্ছ পানির সরোবর আর হয় না। এর চারদিকে শ্বেতমর্মরে বাঁধানো সবকিছু। বেশ জমেছিল……।'

আমি অধীর হয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু তুমি কি মনে কর সে এত বোকা যে তোমার প্রেমে পড়বে?'

'আমার প্রেমে পড়বে এটা আর তেমন বিচিত্র কি? আমি তো অনেককাল থেকে তাকে জানি। তুমি জান না, সে আমাকে কত ভালবাসে। সে তার শয্যাকক্ষে স্বর্ণনির্মিত কৃষ্ণমূর্তি স্থাপন করেছে। রোজ সকাল-সন্ধ্যা মীরা বাঈয়ের পোশাক পরে এর সামনে নৃত্য করে। নৃত্যের প্রতি তালে তালে সে আমাকে মুগ্ধ করতে চায়। প্রতি কথায় সে বলে, তুমি একটিবারের জন্যেও আমাকে যদি দর্শন দাও তাহলে আমি তোমার চরণ ধুয়ে প্রতিনিয়ত পানি পান করব। আর আমি তোমার উদ্দেশ্যে এমন ভজন পরিবেশন করব যে, মীরা বাঈর কথাও তুমি ভুলে যাবে।'

আমি বললাম, 'বজ্জাতি, সব বজ্জাতি।'

'না, এতে কোন কৃত্রিমতা নেই। ওর অন্তঃকরণটা বেশ ভালো। আমি অনেক দিন ধরে ওকে দেখে আসছি। আমি কাউকে দর্শন দিলে তো এভাবেই দিয়ে থাকি। কাউকে কষ্টিপাথরে যাচাই না করে আমি দর্শন দিই না। আজ সকালে পূজার সময় সে বুকে ছোড়া ছুঁইয়ে দিয়ে বলে উঠল—ভগবান তুমি যদি এই মুহূর্তে আমাকে দর্শন না দাও, তাহলে এই ছোড়া আমার বুকে বসিয়ে দোব। বাধ্য হয়ে তক্ষুণি আমাকে সেখানে হাজির হতে হলো।'

আমি বললাম, 'যত্ন-আত্তি কেমন করল সে?'

'সে গঙ্গার পানি দিয়ে আমার চরণ ধুয়ে দিলো, রেশমী বসন পরতে দিলো আর খেতে দিলো সব চাইতে সুস্বাদু খাবার। সে প্রাণমন ঢেলে আমাকে মধুর গান শোনালো। সে গানে আমি বিভোর হয়ে গেলাম।'

আমি বললাম, 'শেষাবধি ফিল্মষ্টারও তোমাকে ভজিয়ে ফেলল। !'

'না, না, এমন কোন কথা নেই। তবে ওর অন্তঃকরণটা একেবারে সরল, আমার জন্যে সে ব্যাকুল। সে তো আমাকে আসতেই দিতে চাইছিল না।'

বললাম, 'থেকে গেলেই পারতে তার কাছে।'

ভগবান বলল, 'তোমার ছড়িটা যেহেতু নিয়ে গিয়েছিলাম।'

তের

আমি বললাম, 'গিয়েছিলে তো ভালো, আমার ছড়িটা কেন নিয়ে গিয়েছিলে?'

ভগবান বলল, 'যেহেতু ওর বাড়ির সামনে দুটো কুকুর বাঁধা থাকে। কুকুর দুটো ভীষণ হিংস্র। আমার বড্ড ভয় লাগে, যদি কামড়ে দেয়। এজন্যে তোমার ছড়িটা হাতে করে নিয়েছিলাম। জানতো, বোম্বে শহরে কোন ভরসা নেই। এ ধরনের কুকুর ভগবানকেও তোয়াক্কা করে না।'

আমি বললাম, 'তুমি এত সকালে বোম্বের দেখেছ কি? তুমি সহজ ধরনের লোক। ভগবানের দোহাই, এসব ধান্ধায় পড়ো না বলছি। এখানে কত হোমড়া-চোমড়া এলো, একদিন সবকিছু খুইয়ে তাদেরকে যেতে হলো।'

ভগবান দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলল, 'না, না, তাকে তুমি চেন না। সে এ ধরনের মেয়ে নয়। তুমি কি মনে করো আমি তার অন্তরের খবর রাখি না?'

আমি কথা কেটে নিয়ে বললাম, 'রাখো তোমার ওসব। আজ কোথায় কোথায় যাবার প্রোগ্রাম আছে, তা ঠিক করেছ? চলো আজ জুহুর দিকে যাব।'

ভগবান চমকে উঠে বলল, 'সে তো আমাকে জুহু যাবার জন্যেই বলেছে।'

'কে বলেছে?'

'আশারাণী।'

আমি একটু রুষ্ট হয়ে বললাম, 'তাহলে আমার সাথে তোমার পাল্লা দিয়ে কোন কাজ নেই। তুমি তার কাছেই যাও।'

ভগবান আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'রাগ করেছ? তুমি আশারাণীকে মোটেই চেন না। আমার প্রতি তার যে ভালবাসা তা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম এবং নিঃস্বার্থ।'

আমি জবাবে কিছু বললাম না। ভগবানের মুঠো থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলাম এবং একটু লজ্জিত হয়ে বসে পড়লাম। এরপর আমি পেছন ফিরে আবার শুয়ে পড়লাম। চোখে আবার একটু তন্দ্রা এলো। হঠাৎ একটা মৃদু শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। চেয়ে দেখলাম, ভগবান ছড়ি হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। বলল, 'আমি তোমার ছড়িটা আবার নিয়ে যাচ্ছি। আজ সেকেণ্ড শোতে সে আমাকে তার নিজের অভিনীত একটি ছবি দেখাবে। আমি কাল ফিরব।'

আমি 'উহু' বলে বক্রোক্তি করে ফিরে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে ভগবান আমার জন্যে মিষ্টি, নারকেল, কুল এবং নানা ফল নিয়ে এসে হাজির হলো। মুচকি হেসে বলল, 'এগুলো সব আশারাণী দিয়েছে, নাও তোমাকে দিয়ে দিলাম সব। কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি, আশরাণীকে চিনতে তুমি বড্ড ভুল করছ। সে আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে, মীরা বাঈর চেয়েও বেশী। এক মুহূর্তের জন্যেও সে আমাকে ভুলতে পারে না। সারাক্ষণ আমার চরণে মাথা রেখে মিনতি জানায়। সত্যি বলতে কি, এখন আমিও তার প্রতি অনেকটা ঝুঁকে পড়েছি। এখন আমিও একটু একটু প্রেম অনুভব করছি মনে হয়।'

আমি চোখ ছানাবড়া করে বললাম, 'কি বললে, তুমিও প্রেমে পড়েছ? হায়, শালী শেষকালে তোমার মতো নিরীহ লোকটাকে ফেঁসে ফেলল! আরে ভগবান, তুমি এসব কি বলছ, তুমি ফিল্মষ্টার আশারাণীর প্রেমে

পড়েছ? তুমি না সকল প্রেম, অনুরাগ আর ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে?'

ভগবান বলল, 'তুমি কখনো তার চেহারা দেখেছ? এমন নিষ্পাপ চেহারা আর হয় না। গতকালের ফিল্ম-ফেয়ারে তার ছবি রয়েছে, দেখে নিও।'

আমি বললাম, 'দেখেছি, বড্ড খাসা চেহারা।'

ভগবান তার রূপ আরো ব্যাখ্যা করতে করতে বলল, 'তার হাতের আংগুলগুলোই বা কত সুন্দর। মনে হয় সৃষ্টি-জগতের প্রথম প্রয়াস এই আঙ্গুলগুলো।'

ভগবান এমন করে বলছিলো যেন আশারাণীকে সে চাক্ষুস সামনে দেখতে পাচ্ছিল। তন্ময় হয়ে আবার বলছিল, 'যখন সে আমার প্রেমে বিভোর হয়ে হাতে খরতাল নিয়ে নাচতে থাকে, তখন মনে হয় সারা বিশ্ব চরাচরে মায়াযাদুর ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়েছে।'

আমি চোখ কপালে তুলে বললাম, 'সর্বনাশ!'

ভগবান আবার বলল, 'আজ রাতে সে আমাকে শাকিলা বানু ভুপালীর কাওয়ালী শোনাবে।'

'একেবারে গোল্লায় গেলে দেখছি। তুমি স্বর্গ থেকে কি মনে করে এ ধরাধামে এসেছ? তুমি না এখানকার শিশু সমাজকে দেখবে?'

'চুলোয় যাক তোমার শিশু সমাজ!'

'তোমার সিদ্ধান্ত তাহলে পাল্টে নিচ্ছ? একটুও ভয় লাগছে না তোমার?'

'জব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া?' অতঃপর ভগবান গুনগুন করে কলিটি আওড়াচ্ছিল। আমি ছটফট করতে করতে ঘরের বাইরে চলে গেলাম।

চৌদ্দ

আমি ভগবানের গা ঝাঁকিয়ে ডেকে তুললাম। সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসলো। আমি বললাম, 'কি হলো? আশারাণী কি ঘর থেকে বের করে দিয়েছে?'

ভগবান হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'আরে না ভাই, ব্যাপারটা অন্য রকম। যা ভেবেছিলাম তা নয়।'

'অন্য রকম মানে? তা হলে আশারাণীর প্রেমের ঘোর কেটে গেছে নাকি?'

ভগবান বলল, 'না, ব্যাপারটা হয়েছিল কি, আশারাণী গত রাতে নাচতে নাচতে আজানু নত হয়ে আমার চরণে দুমড়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে বলল, 'ভগবান আমার উপর ভীষণ বিপদ এসে পড়েছে, ভগবান আমাকে এই সংকট থেকে বাঁচাও।'

আমি বললাম, 'সংকটটা কি ছিল তার? নিশ্চয়ই সে তার বোকার হদ্দ স্বামীটিকে তালাক দিতে চাইছিল, না?'

ভগবান বলল, 'না, ওসব কিছু না। সে সংকট হলো ইনকাম ট্যাক্স।'

চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। ভগবান চুপচাপ বসে আক্ষেপে তার হাত কচলাচ্ছিল। আমি নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম, 'শেষাবধি তোমার বেলাতেও নিঃস্বার্থ ভালবাসাটুকু হলো না। তোমার ভালবাসাতেও স্বার্থ?' ভগবান জবাবে কিছুই বলল না। আমি আবার বললাম, 'এ জগতে যে কেউ তোমাকে ভালবাসে, তাতে কিছু না কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে। যার যে বস্তুর অভাব, সেটুকু পাবার জন্যে তোমার কাছে ধর্ণা দেয়। পুত্র, কন্যা, বাড়ি, স্বামী, অন্নবস্ত্র·····আর যার কাছে এর সবই আছে, এ জগতেই সে নিজের জন্যে স্বর্গ তৈরী করে এবং পরকালের স্বর্গে নিজের জায়গা করে নেবার জন্যে তোমার কাছে আসে। লক্ষ লক্ষ টাকার কালোবাজারী করে একটা মসজিদ বা মন্দির বানিয়ে তোমাকে খুশী করা ঘুষ নয় তো কি? এ ধরনের

লোকদের কাছে তুমি একজন আই. সি. এস. বা একজন মিনিষ্টারের চাইতে বেশী কিছু নও। এরা তোমাকে পূজা করে থোড়াই, তারা নিজেদের ইপ্সিত বস্তুর পূজা করে। নিজেদের ভয়ের পূজা করে।'

আমি রাগে ক্ষোভে আরো অনেক কিছু বলতাম। কিন্তু ভগবানের হতমান চেহারা দেখে আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি টেনে তাকে বুকের সাথে চেপে ধরলাম। বুকে চেপে ধরতেই ভগবান ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তাঁর কান্নায় এমন অভিমান প্রকাশ পাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল আজই ধরিত্রী দ্বিধা হয়ে যাবে।

পরদিন থেকে আমরা আমাদের পুরনো কাজে ফিরে গেলাম। পকেটের মালপানিও ফুরিয়ে এসেছিল। অবশ্য এ ক্ষেত্রে স্বর্গ থেকে প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ আনিয়ে নেবার কোন প্রশ্ন উঠে না। আমরা আবার বেশ বদলে শিশুর রূপ ধারণ করলাম। অবশ্য এবারে একটু বড়সড় শিশুর রূপ ধরলাম এবং চার্চগেট ষ্টেশনের কাছে কোন কাজ পাবার আশায় ঘুরাফিরা করতে লাগলাম। এখানে আমাদের মতো ছেলেদের একটা গ্যাং ছিল। এরা ট্রেন থেকে নেমে আসা ভদ্রলোকদের জন্যে টেক্সি যোগাড় করে দিত। টেক্সি খুঁজতে খুঁজতে কখনো এরা 'ইয়োস সিনেমা' বা 'এম্বেসেডর হোটেল' অবধি চলে যেতো। যেখানেই খালি টেক্সি পেতো, আরোহী পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতো, এজন্যে এরা দু'আনা এক আনা পেতো। অবশ্য কোন খদ্দের মাত্র এক আনা দিলে তা নিয়ে লড়াই ঝগড়া বেঁধে যেতো। এদের দলের ছেলেরা মিলে তখন নিরীহ খদ্দেরকে নাজেহাল করে ছাড়তো। আমরা দু'জন এদের গ্যাং-এ শামিল হবার জন্যে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনক্রমেই এরা আমাদেরকে গ্রহণ করতে চাইলো না। এদের দলের লিডার আমাদেরকে বলল, 'আমরা নিজেরাই দিনভর ছুটাছুটি করে দিনের শেষে আট-দশ আনার বেশী উপার্জন করতে পারি না। এতে আমাদের সারা দিনের নাস্তা এবং এক বেলার খাবারের সংস্থান হয়। এ তল্লাটে টেক্সি কম অথচ দলে ছেলের সংখ্যা বেশী। আজকাল লোকের

আমাদের উপেক্ষা করে নিজেরাই টেক্সি খোঁজ করে বেড়ায়। এমতাবস্থায় দলে যদি আরো দু'জন শামিল হও, আমাদের বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না।'

এখান থেকে নিরাশ হয়ে আমরা সামনের ফুটপাথের এক বুট পালিশ ছোকড়ার কাছে চলে এলাম। ছেলেটির পরনে একটা রঙ্গিন সার্ট ছিল। কোমরে বেল্ট আর পরনের কালো পেণ্টটা হাঁটু অবধি উঠানো ছিল। পালিশের বাক্সটি তার সামনে ছিল, সেটাতে বিভিন্ন রঙ্গের পালিশের কৌটা সাজানো রয়েছে। আমাদের মনে হলো, এ কাজটি আমাদের জন্যে মন্দ হবে না।

বুট পালিশওয়ালা ছেলেটি যে দাদার কাজ করতো, আমরা তার কাছে চলে গেলাম। আমাদের করুণ কাহিনী শুনে সে বলল, 'আমি তোমাদেরকে কাজ দিতে পারি, তবে শর্ত হলো, সকাল আটটায় এখানে এসে হাজির হতে হবে এবং রাত বারটা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে।'

ভগবান চোখ কপালে তুলে বলল, 'তা কেন? সরকারী আইনের চেয়ে আট ঘণ্টা বেশী তুমি আমাদেরকে খাটাতে পারবে না।'

সে বলল, 'তাহলে তোমরা সরকারের কাছে যাও, আমার কাছে কেন এসেছ?'

ভগবান বলল, 'এ জগত ভগবানের, সরকার এ রাষ্ট্র চালায়। সরকার এই ফুটপাথ তো কাউকে ইজারা দেয়নি। আমরা দু'টি ক্ষুধার্ত ছেলে, পালিশের বাক্স নিয়ে এখানে বসে যাবো। যা কিছু কামাবো, তা দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করব।'

লোকটি বলল, 'এমন স্বাধীন ধান্ধা বোম্বেতে চলে না মিষ্টার। এ ফুটপাথকে আমরা দাদারা খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে নিয়েছি। এ জায়গার জন্যে আমরা পয়সা দিই, সাপ্তাহিক নজরানা দিই। তুমি আমার জায়গায় বেআইনী বসলে লালঘরে যেতে হবে। মনে রেখ, এটা বোম্বাই শহর। এখানে কাজ করতে হলে আমাদের অধীনে

কাজ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে দু'টো কালো প্যান্ট, দু'টো বুশ সার্ট, দু'বেলা খাবার, দু'বেলা-নাস্তা দেব। পালিশের বাক্স, কৌটা, সরঞ্জাম সব আমি দেব। তোমরা শুধু দিনের শেষে এক টাকা নিয়ে কেটে পড়বে। বাকী কামাই সব আমার। দিনের শেষে যখন রাত হয়ে আসবে, তখন মেয়ে সাপ্লাইর কাজ শুরু হবে। সে কাজও তোমাদের করতে হবে।'

ভগবান চোখ ছানাবড়া করে বলল, 'তোমরা ছেলে-ছোকড়াদের দ্বারা মেয়ে সাপ্লাইর কাজও করাও?'

লোকটি মৃদু হেসে বলল, 'মিষ্টার, তুমি কোন শহর থেকে এসেছ? এমন আজগুবি প্রশ্ন করতে তো আর কাউকে কখনো শুনিনি। এই বোম্বাই শহরে যে আকাল চলছে। ছেলেরা যদি নিজেরা এভাবে কামাই না করতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তো না খেয়েই মারা যাবে। এজন্যে ছেলেদেরকে কাজ করতে হয়। খবরের কাগজ বিক্রি থেকে শুরু করে মেয়ে সাপ্লাই পর্যন্ত সব কাজই তাদেরকে করতে হয়। এক কাজের জন্যে আমার কাছে দশ ছেলে এসে হাজির হয়। দশটি ছেলেকে যদি পুলিশে নিয়ে যায় তো আরো বিশটি এসে জোটে। তোমরা জান না, এই শহরে বেকারত্ব কতো বেশী। জানি না, তোমরা কোন্ মুলুক থেকে এসেছ, আর মেয়ে সাপ্লাই'র কাজটা এমন কি-ই বা খারাপ কাজ। তোমাদের মতো ছেলেরা যদি এ কাজ না করে তো অন্যেরা করবে। তবে কম বয়েসী ছেলেদের বেলায় সুবিধে হলো যে, তোমাদেরকে কেউ সন্দেহ করবে না। কোন খদ্দেরের বাড়ীতে গেলে, কোন মেয়েকে সাথে নিয়ে চললে, কোন বাড়ীতে ঢুকে পড়লে—কোন কিছুতেই পুলিশ তোমাদেরকে সন্দেহ করতে পারবে না। এ কারণে ছেলেদের জন্যে এ কাজটি বড় উত্তম। একদম সেফ। পয়সাও বেশ ভাল। নইলে দিনভর বুট পালিশ করে কি-ই বা এমন পাওয়া যায়। মাত্র এক টাকা। আমার ছেলেপেলেগুলো তো রোজ এক টাকার সিনেমাই দেখে। বাকী খাই-খরচার জন্যে পয়সা কোত্থেকে আসে? এজন্যে এরা শখ করেই রাতের বেলা এ ধান্ধা করে থাকে। এ কাজে

তারা কখনো পাঁচ টাকা পর্যন্ত লাভবান হয়। তোমাদের দু'জনকে আমার বেশ ভদ্র গোছের ছেলে বলে মনে হয়। বিশেষ করে এই ছেলেটিকে (ভগবানকে দেখিয়ে) তো খুবই সহজ সরল মনে হয়। এ ধরনের ছেলেরাই এ কাজ ভালো পারে। দশ বছর তদন্ত করেও পুলিশ এদেরকে সন্দেহ করতে পারে না। বলো, এ কাজে আসবে?'

আমি ভগবানের দিকে তাকালাম, ভগবানও আমার দিকে তাকালো। শেষে ভগবান আমার হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চলো এখান থেকে কেটে পড়া যাক।'

আমি বললাম, 'আমার বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে। দাদা লোকটা যা বললে চলো না তা-ই মেনে নিই।'

ভগবান প্রায় চীৎকার করে বলল, 'না, না, না, তা হয় না। তুমি জলদি চলো!'

পনেরো

এবারে মেরিন ড্রাইভের পথ ধরে চলছিলাম। কখনো কখনো সমুদ্রের তরঙ্গ ভঙ্গের উত্তাল গর্জন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল আমাদের পায়ের কাছে। আমরা ক্রমান্বয়ে চৌপাটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

চলতে চলতে ভগবান আমাকে বলল, 'ছেলেপিলেদের দ্বারা এসব নোংরা কাজ করানো উচিত নয়। শিশুরা তো দেশের সম্পদ। জীবনের প্রথম ঊষালগ্নেই এদের অন্তঃকরণকে কলুষিত করে পাপ-পঙ্কিল জীবনের দিকে চালিত করা ঠিক নয়। এসব কোমলমতি শিশুরা থাকবে স্কুলে। এ বয়সই তো এদের আচার, ব্যবহার এবং ভদ্রতা শেখার সময়। অথচ এ সময়েই তাদেরকে মদ বিক্রি করতে দেখা যায়। মেয়ে সাপ্লাইর মতো চরম নোংরা কাজও এদেরকে দিয়ে করানো হয়। কুকুরের মতো টেক্সির পেছনে ধাওয়া করে এক আনা দু' আনার জন্যে। আমি তো এই শিশুদেরকে এ কাজের জন্যে পৃথিবীতে পাঠাইনি।

বোম্বেতে কি কোন স্কুল নেই এসব ছেলেপিলেদের জন্যে? তোমাদের সমাজের ছেলেপিলেরা স্কুলে যায় না? ভালো কাপড়-চোপড় পরে বগলে বই নিয়ে তোমাদের ছেলেরা কি স্কুলে কোনদিন যায় না? তোমাদের শিশুরা জীবনের পাঠ কি মাষ্টার মশাইর কাছ থেকে শেখে না? এ ধরনের স্কুলে পড়ুয়া একটি ছেলেও কি নেই? আমি কি এসব ছেলেদেরকে দু'নয়ন ভরে একটু দেখতে পাব না?'

আমি বললাম, 'স্কুলে পড়াশুনা করে এ ধরনের ছেলেপিলে একেবারে যে নেই, তা নয়। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। চলো তোমাকে এ ধরনের ছেলেপিলেদের দেখিয়ে দেবো মালাবার হিল স্কুলে। মালাবার হিলের মডার্ণ স্কুলে এ ধরনের ফুটফুটে ছেলেদের অন্ত নেই। কিন্তু আমি যে চলতে পারছি না। ক্ষুধায় আমার পেট দুমড়ে আসছে।'

ভগবান বলল, 'কই তোমার সেই মডার্ণ স্কুল কোথায়?'

আমি বললাম, 'ওইতো সামনের পাহাড়ের টিলার ওপরে।'

ভগবানের দৃষ্টি সহসা পাহাড়ের উপরের সুদৃশ্য স্কুলের দিকে নিবদ্ধ হলো। ভগবান আমাকে বললো, চোখ বন্ধ করতে। আমি চোখ বন্ধ করে নিলাম। পরমুহূর্তেই দেখলাম, আমরা দু'জন মালাবার হিল স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি।

স্কুল ভবনটি খুবই সুদৃশ্য, সুরম্য। দ্বিতল ভবনটির বিভিন্ন দেয়ালে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হয়েছে। পুরোটা ভবনে গোলাবী রং-এর বার্নিশ আর দরজা-জানালায় দেয়া হয়েছে সাদা রং। লনে সবুজ ঘাস আর রকমারী ফুলের সমারোহ। লনে ছোট শিশুরা দলে দলে ছুটাছুটি করছিল।

ভগবান বলল, 'এই বুঝি তোমাদের স্কুল?' এরপর ভগবান স্কুলের চাপরাসীকে থামিয়ে বলল, 'তোমাদের স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল কোথায়?'

চাপরাসী ভ্রূ-কুঞ্চিত করে আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিল। ময়লা অগোছালো কাপড়-চোপড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা যদি বার্নিশ কোম্পানী থেকে এসে থাকো তাহলে সোজা একাউন্টেন্টের কাছে চলে

যাও এই পথ ধরে।'

ভগবান কণ্ঠে দৃঢ়তা এনে বলল, 'না, আমরা কোন বার্নিশ কোম্পানীর লোক নই। আমরা প্রিন্সিপ্যালকে চাই।'

বাধ্য হয়ে চাপরাসী বামদিকে হাত দেখিয়ে বলল, 'বড় সা'ব এদিকে বসেন।'

চাপরাসী লোকটি আমাদেরকে যে দরজার দিক দেখিয়ে দিলো, তার ভেতরের কক্ষটি বেশ সুসজ্জিত। ভেতরের জানালাগুলোতে রয়েছে কড়া সবুজ রং-এর পর্দা। বাইরে পিতলের তৈরী নাম-ফলকে লেখা রয়েছে 'প্রিন্সিপ্যাল'। দরজার দু'পাশে রয়েছে দু'টো ফুলের টব। এ সময় প্রিন্সিপ্যালের চাপরাসী কোথায় যেন গিয়েছিল। এই সুযোগে আমরা দু'জন ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

প্রিন্সিপ্যাল ভদ্রলোকের বেশ গোলগাল সুন্দর চেহারা। মাঝারী ধরনের লম্বা-চওড়া লোক। ভদ্রলোক যখন হাসেন, মনে হয় একটা চমৎকার জবা ফুল ফুটে রয়েছে। অথবা মনে হয় একটা উজ্জ্বল ১০০ পাওয়ারের বিজলীবাতির আলোকে তার মুখটা ঝলসানো। হাসির সময় তার মুখ থেকে নিরন্তর আলো ঠিকরে পড়তে থাকে। এ সময় তিনি টেবিলে ঝুঁকে কি যেন লিখছেন। কারো আগমন টের পেয়ে মাথা না তুলেই বললেন, 'বসুন, আমি আপনাদের কি খেদমত করতে পারি?'

ভগবান বলল, 'আমরা দু'জন আপনার স্কুলে ভর্তি হতে চাই।'

প্রিন্সিপ্যাল এবার মাথা তুললেন এবং তার মুখের উপরে বর্ণিত সেই হাসি ফুটে উঠলো। কিন্তু আমাদের চেহারা ও পোশাক-আশাক দেখে তার মুখের সেই উজ্জ্বল হাসি মিলিয়ে গেল। মনে হলো কে যেন সুইচ অফ করে দিয়েছে। এবারে তাকে খুব গভীর মনে হলো।

গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'মিউনিসিপ্যাল স্কুলে চেষ্টা করো।'

ভগবান বলল, 'কিন্তু আমরা তো এ স্কুলেই ভর্তি হতে চাই।'

প্রিন্সিপ্যাল বলল, 'কোন ক্লাশে ভর্তি হতে চাও?'

'পঞ্চম শ্রেণীতে।'

প্রিন্সিপ্যাল জবাব দিলেন, 'পঞ্চম শ্রেণীতে তো আগামী বছরের জন্যে সকল সিট রিজার্ভ হয়ে আছে।'

ভগবান বলল, 'এটা কি স্কুল, না রেলগাড়ীর কম্পার্টম্যাণ্ট?'

প্রিন্সিপ্যাল আসলে একজন ভারতীয় হলেও এই মুহূর্তে তাকে বিদেশী মনে হচ্ছিল। দু'বাহু নাড়তে নাড়তে বললেন,'...আর আমরা সেসব ছেলেদেরকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি যারা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়।'

তারপর ভগবানের দিক মুখ করে বললেন, 'তুমি পরীক্ষায় কেমন রেজাল্ট করেছ?'

আমি বললাম, 'ওতো সব সময় সব ক্লাশে ফার্ষ্ট হয়।'

প্রিন্সিপ্যালের মুখে আবার উজ্জ্বলতা ফিরে এলো। প্রিন্সিপ্যাল এবারে তার দিকে একটা ফর্ম এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার বাবার কি নাম এবং তার পেশা কি?'

ভগবান বলল, 'আমার তো বাবা-মা কেউ নেই।'

'তাহলে তোমার পড়ার খরচ কে চালাবে?' প্রিন্সিপ্যাল ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন।

ভগবান বলল, 'ফার্ষ্ট ক্লাসের ছেলেদের জন্যে কোন বৃত্তি নেই?'

'হ্যাঁ, তাতো মাসে পনের টাকা মাত্র।'

ভগবান বলল, 'ওই পনের টাকা দিয়েই আমার চলবে।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'পনের টাকা তো আমার স্কুলের ছেলেদের ধোপা খরচ। সবকিছু মিলিয়ে আমার ছেলেদের মাথাপিছু খরচ হয় প্রতি মাসে ২৫০ টাকা।'

ভগবান বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'এক ছেলের পেছনে আড়াইশ' টাকা! এক ছেলের পেছনে এত টাকা খরচ করতে পারে, বোম্বেতে এমন ক'জন লোক আছে?'

'কয়েক হাজার তো অবশ্যই হবে।'

'তাহলে বাকী লোকদের ছেলেপিলে কোথায় পড়ে?'

'তাদের জন্যে অন্য স্কুল রয়েছে।'

ভগবান বলল, 'কিন্তু সেগুলো তো এত ভালো স্কুল নয়। যাদের ছেলেরা যদি এ ধরনের উন্নত মানের স্কুলে পড়তে চায়, তাদের কি করতে হবে?'

প্রিন্সিপ্যাল উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তাদেরকে লক্ষপতি দেখে বাপ নির্বাচন করতে হবে। আমার হাতে এত সময় নেই—এসব ফালতু কথায় সময় কাটানোর জন্যে। এবার তোমরা আসতে পারো।'

ষোল

মানে মানে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ভগবানের মনটা কেমন উশখুশ করছিল। বারান্দা দিয়ে চলতে চলতে সে হঠাৎ একটা ক্লাশে ঢুকে পড়ল। আমি দু'হাতে বাধা দেয়া সত্ত্বেও সে ঢুকে পড়ল। বাধ্য হয়ে আমাকেও তার সঙ্গ নিতে হলো। ক্লাশে ঢুকে আমরা একেবারে পেছনের বেঞ্চে যেয়ে বসলাম। ক্লাশের ছেলেরা চোখ ছানাবড়া করে আমাদের দেখতে লাগলো। ক্লাশে মাষ্টার মশাই বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল অনর্গল। এজন্যে আমাদের কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার সময় ছিল না তার। টিচার নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছিলেন—নেপোলিয়ান বোনাপার্ট একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন।

ভগবান চট করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কেন তিনি একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন?'

'যেহেতু তিনি ইউরোপ জয় করেছিলেন।'

ভগবান আবার প্রশ্ন করল, 'সে কি একাই ইউরোপ জয় করেছিল? তার অভিযানে সাহায্য করার জন্যে কি লক্ষ লক্ষ সৈন্য ছিল না? সৈন্যদের সাহায্য ছাড়া যদি সে দেশ জয় করতে পারতো তাহলে তাকে আমি একজন বিরাট মানুষ বলে মানতে পারতাম। যুদ্ধ করার মধ্যে বাহাদুরিটা কোথায়? যুদ্ধে তো হাজার হাজার লোক মারা যায়। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ সংহারকারীকে কোন্ যুক্তিকে বড় মানুষ বা মহান

ব্যক্তি বলা যেতে পারে ?'

এতক্ষণে টিচার ভগবানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালেন এবং বললেন, 'তুমি কে ? তোমাকে তো এ ক্লাশের ছেলে বলে মনে হচ্ছে না। তোমাদের পরনে একি পোশাক, স্কুলের ইউনিফর্ম কোথায় ? গেট আউট !'

ভগবান অট্টহাসি হেসে বাইরে চলে এলো।

টিচার তার এহেন দুষ্টুমিতে ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন।

লনের একদিকে ক'টি ছেলে ভলিবল খেলছিল। আমরা এবার তাদের দলে যেয়ে শামিল হলাম।

ভগবান হঠাৎ বলটি ধরে ফেলে বলল, 'আমরাও তোমাদের সাথে খেলবো।'

সমস্বরে সবাই বলল, 'তোমরা কে ? তোমরা আমাদের স্কুলের ছেলে নও।'

ভগবান বলল, 'স্কুলের ছেলে নই তো কি হয়েছে ? তোমরা ছেলে, আমরাও ছেলে, মিলেমিশে খেলা করব।'

'না, আমরা তোমাদের সাথে খেলব না। আমাদের বল ফিরিয়ে দাও বলছি। তোমাদের সাথে খেলব না।'

'কেন খেলবে না ? কিছুক্ষণ খেলতে দাও। মনটা একটু হালকা হবে।' ভগবান কাচুমাচু করে বলল।

'আমাদের বল দেবে কিনা বলো ?' বলে সবাই আমাদের ঘিরে ধরল।

একটা ছেলে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'হতভাগা, নোংরা, কুকুর কোথা-কার ! স্কুলের ভেতরে ঢুকে পড়েছ। দেখাচ্ছি তোমাদের মজা !'—বলেই ছেলেটি ভগবানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভগবানের নাকে-মুখে দমাদম কিল-ঘুষি পড়তে লাগল। আমি প্রাণপনে বাধা দিতে গিয়ে চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। আমার নাকে-মুখেও কয়েক ঘা লেগেছে ততক্ষণে।

সন্ধ্যায় আমি এবং ভগবান ফুলা নাক এবং ক্ষত-বিক্ষত হাত-পা

নিয়ে ডেরায় ফিরছিলাম। ভগবান চরম আক্ষেপের সুরে বলল, 'ছি! এই বুঝি তোমাদের শহর, যেখানে ছেলেরা ছেলেদের দেখতে পারে না।'

ডেরায় ফিরে এসে ক্লান্তি এবং একরাশ যন্ত্রণা নিয়ে হেলান দিয়ে বসেছিলাম।

ভগবান আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ঘুমাচ্ছ না কেন?'

'ঘুম আসছে না, ঘুমোব কেমন করে?'

ভগবান বলল, 'ঘুম কেন আসছে না?'

'ক্ষুধা পেয়েছে তাই।'

ভগবান একটু মুচকি হেসে বলল, 'ক্ষুধা পেয়েছে তো কি হয়েছে, গোস-পরাটা পোলাও-বিরানী টিকেন-টিক্কা যেটা ইচ্ছে সেটা আনিয়ে নাও। বোম্বের যে কোন একটা ভালো রেষ্টুরেন্টে এর সবগুলোই পাবে তুমি।'

আমি ক্ষুধার তীব্রতা প্রকাশ করে বললাম, 'কিন্তু তোমার এই দুনিয়ায় বিনা পয়সায় তো কোনটা পাবার জো নেই।'

ভগবান বলল, 'কে বললে বিনা পয়সায় কিছু পাওয়া যায় না? বাতাস তো রয়েছে সকল সৃষ্ট জীবের জন্যে। আমি বাতাস 'ফ্রি অব কস্ট্' করে দিয়েছি।'

আমি দাঁতে দাঁত পিষে বললাম, 'ঠিক আছে, আজ রাতে বাতাস খেয়েই কাটাবো। চলো, বাইরে চলো।'

ভগবান বলল, 'না, আমি যাব না। আমার ঘুম আসছে।'

আমি বললাম, 'একচেটিয়া তোমার ঘুম আসলে তো চলবে না। আমার যেহেতু ঘুম আসছে না, এজন্যে তোমারও ঘুমানো চলবে না।'

ভগবান বলল, 'কোথায় যেতে চাও?'

'হাওয়া খেতে।' বলেই আমি ভগবানকে চাটাই থেকে টেনে হিঁচড়ে তুললাম।

ভগবান আপত্তি করে বলল, 'আমাকে শুতে দাও।'

আমি বললাম, 'তা হয় না। আমি যতক্ষণ কোন কিছু খেতে না পাব, তোমাকে শুতে দেব না।'

অতঃপর ভগবানকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। রাত সবে এগারটা বেজেছে। তবু চারদিকে দম আটকে আসবার মতো ভ্যাপসা গরম। মনে হচ্ছে, গরম ধোঁয়াটে বাতাস গলার মধ্যে দম আটকে ফেলতে চায়।

আমি বললাম, 'এগুলোকে তুমি হাওয়া বলতে চাও?'

ভগবানের চোখে-মুখে তখনো ঘুমের আমেজ। ভগবান তখনও ছেলের রূপ ত্যাগ করেনি। কচি খোকার মতো মুখখানা···মায়াবী চেহারা···আমার কথা যেন তার কানে গেল না।

আমি তার গা ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'কি, শুনতে পাও না? ওই দেখ।'

ভগবান বলল, 'কই, কি হয়েছে?'

আমরা চলতে চলতে প্রায় পুলের পাদদেশে এসে পড়েছি। চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। রাজপথের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত খাঁ খাঁ করছিল। আশে-পাশের গলিগুলোও নীরব, অন্ধকার। পুলের নিম্নাংশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আশেপাশে ময়লা আবর্জনার স্তূপ। পুলের অনতিদূরে একটা লাইট পোষ্টের বাতি টিম টিম করে জ্বলছিল। হঠাৎ দেখা গেল পুলের মাঝ-খানে বসে একটা দশ-এগার বছরের ছেলে ঠোঙ্গা থেকে তুলে তুলে 'ভিলপুরী' খাচ্ছে।

আমি বললাম, 'ওই দেখ, ছেলেটি ভিলপুরী খাচ্ছে। চলো, ওর কাছ থেকে ওগুলো ছিনিয়ে নিই।'

ভগবান বলল, 'এটা তো ভালো কাজ নয়।'

আমি বললাম, 'তুলে রাখো তোমার ভালোমন্দ, ক্ষুধায় মরে গেলাম!'

ভগবান আবার বলল, 'জবরদস্তি কেড়ে নেওয়া মস্তবড় পাপ। আমি কোনমতে এর অনুমতি দিতে পারি না। তবে আমরা ছেলেটির কাছে খাবার ভিক্ষা করতে পারি।'

আমরা আস্তে আস্তে ছেলেটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাদের দেখে ছেলেটির মনে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। সে নিশ্চিন্ত মনে ভিলপুরী খাচ্ছিল। আমরা পূর্বে পরিকল্পনা মাফিক ছেলেটির কাছে

আমাদের ক্ষুধার কথা জানালাম। জানাতেই ছেলেটি কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে ঠোঙ্গাটি আমাদের দিকে এগিয়ে দিল। এগিয়ে দিতেই আমরা ঠোঙ্গাটি লুফে নিলাম এবং চোখের পলকে যা ছিল গলাধঃকরণ করে ফেললাম।

আমাদের এহেন অবস্থা দেখে ছেলেটি বলল, 'মনে হচ্ছে, তোমরা ক'দিন ঘরে কিছু খাওনি।'

আমি বললাম, 'তা তো বুঝতেই পারছ।'

সতেরো

ছেলেটি তার পা পুলের নীচের দিকে নামিয়ে দিয়েছিল। পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'তোমরা দু'জন যদি আমার সাথে কাজ করতে রাজী হও, তাহলে আমি একটা টাকা দেব।'

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'এক টাকা! পুরো একটা টাকাই দেবে বলছ?'

'হ্যাঁ, এক টাকা।'

ভগবান বলল, 'আমাদের কাজটা হবে কি?'

'ছেলেটা পা দোলাতে দোলাতে পুলের ডান দিকে হাত নির্দেশ করে বলল, 'ওদিকের মোড় থেকে খুব শীগগিরই এক পারসী বাবা বেরিয়ে আসবে। মাথায় থাকবে তার কালো টুপি, পরনে সাদা আচকান আর হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। সে খুব শীগগিরই আসবে। সে বেরিয়ে আসতেই তোমরা দু'জন তার পায়ে যেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।'

'পায়ে পড়তে যাবো কেন?'

'পায়ে পড়ে শুধু বলবে, পারসী বাবা, তোমার মতো মানুষ হয় না। দয়া করে এক আনা পয়সা দাও। দু'দিন থেকে আমরা ভুখা আছি। দয়া করে এক আনা.....'

আমি বললাম, 'তারপর ?'

তারপর সে তোমাদের যদি কিছু দেয় তো ভালো, না দিলেও সই। তোমাদের এক টাকা ঠিকই থাকবে।'

'কিন্তু দু'আনা উপার্জনের জন্যে তুমি আমাদের দু'জনকে দু'টাকা দেবে কেন ?'

ছেলেটি বলল, 'ফালতু কথা জিজ্ঞেস করে কোন লাভ আছে ? পয়সা যদি কামাতে চাও, যেভাবে বলছি, সেভাবে লেগে যাও। কারো পায়ে পড়ে থাকলেও কে দেয় তোমাদের একটা পয়সা ?'

ভগবান আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ছেলেটি তো ঠিকই বলেছে। ছেলেটি বেশ দয়ালু বলে মনে হচ্ছে। দু'আনা কামাই হোক বা না হোক, সে আমাদের পুরো টাকা দিতে রাজী। ঠিক এ ধরনের ছেলেদের সন্ধানেই আমি স্বর্গ থেকে এসেছিলাম। তুমি মনে করছ, শহরে শিশুরা কি অবস্থায় আছে আমি বুঝি জানি না। কিন্তু আমার বিলক্ষণ জানা আছে, এ ধরিত্রীর পাপ-সাগরে একটা না একটা নিষ্পাপ শিশু আমি পাবই। এ ছেলেটিই আমার সেই ছেলে। সৃষ্টির আদিকালে আমি যে নিষ্পাপ শিশুদের সৃষ্টি করেছিলাম, তারা সংখ্যায় কম হলেও তাদের অস্তিত্ব নেই এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

ভগবান একটা অন্তরঙ্গ দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটির দিকে তাকালো, ছেলেটিও প্রতিদানে তার প্রতি মুচকি হেসে তার ঝুলন্ত পা দু'টো ঘন ঘন নাড়তে লাগলো।

এতদসত্ত্বেও আমার মনে এক অজানা সন্দেহ দোল খেতে লাগলো। এজন্যে আমি ছেলেটিকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কি করে বুঝব যে, তুমি আমাদের টাকাটা ঠিকই দেবে ? তোমার কাছে টাকা আছে কি নেই, তাই বা কেমন করে জানব ?'

এ কথা শুনে ছেলেটি তার পকেট থেকে এক টাকার দশটা নোট বের করে আমাদের চোখের সামনে দোলাতে লাগল।

'এই চেয়ে দেখো, আমার কাছে এক টাকা নয়, দু'টাকা নয়, পুরো দশ টাকা রয়েছে। এই টাকার ভেতরে, তোমাদের অংশও রয়েছে।

তোমাদের যদি এমন অবিশ্বাস হয়, তাহলে নাও আট আনা আগাম দিচ্ছি। যখন পারসী বাবার পায়ে হুমড়ি খেয়ে ভিক্ষে চাবে, তখন পাবে বাকী আট আনা।

আমরা আট আনা হাতে পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। তার পর আমরা পুলের উপর নিশ্চুপ হয়ে পারসী বাবার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই পারসী বাবা, পরনে সাদা আচকান, মাথায় কালো টুপি আর হাতে ব্যাগ নিয়ে গলির মোড় থেকে বেরিয়ে এলো।

তাকে দেখতেই ছেলেটি আমাদের পাঁজড়ে গুঁতো মেরে বলল, 'ঐতো এসেছে। আরো কাছাকাছি আসতে দাও। এই পুলের কাছে আসলেই পা জড়িয়ে ধরবে।'

আমি বললাম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এমন করে পা জড়িয়ে ধরবো যে, পয়সা না দেয়া পর্যন্ত পা ছাড়বোই না শালার।'

'সাবাস!'

পায় পায় লোকটি পুলের কাছাকাছি এসে উপনীত হলো। কাছে আসতেই আমি লাফিয়ে পড়ে তার পা জড়িয়ে ধরলাম।

লাচার হয়ে লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি হয়েছে, অমন করছ কেন?'

'বড্ড গরীব, দু'দিন কিছু খাইনি। দয়া করে দু'আনা পয়সা দাও।'

পারসী বাবা রেগে গিয়ে বলল, 'ভাগো, যত্তসব……!'

আমি আরো সজোরে তার পা জড়িয়ে ধরলাম। বার বার বলতে লাগলাম, 'বড্ড গরীব, দু'দিন উপোষ……'

নিরুপায় হয়ে পারসী বাবা তার হাতের ব্যাগ খুলে খুচরো পয়সা খুঁজতে লাগলো। আমি বার বার আমার সেই কথা আওড়াচ্ছিলাম।

সহসা পারসী বাবার কণ্ঠ থেকে অন্ধকারের বুক চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। হাতের ব্যাগটি তার মাটিতে পড়ে গেল। রক্তাক্ত হয়ে সে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল। পর মুহূর্তে দেখতে পেলাম সেই ছেলেটির হাতে একটি রক্তাক্ত চাকু। চোখের পলকে সে দৌড়ে রেলওয়ে ইয়ার্ড পার হয়ে অনেক দূরে পালিয়ে যেতে লাগলো এবং এক সময় সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

এসব মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ঘটে গেল। এবারে ভগবানের চক্ষু চড়কগাছ। ভগবান নীচু হয়ে দেখলো পারসী বাবার নিস্পন্দ দেহটি, তার নিথর চোখ দুটো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল, তার ব্যাগটিও খোলা পড়েছিল। ব্যাগের ভেতরে কিছু মিষ্টান্ন রয়েছে। ছেলেপিলেদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল বাসায়।

একটি চলমান গাড়ীর সার্চ লাইটের আলো এসে পড়লো আমাদের উপর। আমি ভয় পেয়ে ভগবানের গা ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'চলো, ভাগো, নইলে ধরে নিয়ে যাবে আমাদের।'

ভগবান তন্ময় ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু এ শবদেহ·····নিষ্পাপ পারসী বাবার কি হবে?·····'

আমি বললাম, 'ওসব রাখো, নইলে এই গ্রেফতার হলাম বলে।'

বলেই আমরা দৌড়াতে লাগলাম। অলি-গলি, রেলপথ ধরে দৌড়াতে দৌড়াতে আমরা ট্রাম ট্রান্সমিশনের গোল চক্করের কাছে এসে উপনীত হলাম। এখানে এসে বড় বিচিত্র মনে হলো এই জীবনের চাঞ্চল্য। চারদিকে নিয়ন বাতির ধবধবে আলো। ছেলেবুড়ো, সুন্দরী মেয়ে ও নানা ধরনের পথচারীদের সমাগমে মুখরিত চারদিক। ট্রাম চলছিল, বাস চলছিল—সবাই যে যার আপন আপন গন্তব্যে চলছিল বিরামহীন।

আঠার

যখন নিরন্ধ্র অন্ধকার ছেয়ে গেল এবং একে একে নগরীর সকল জাগ্রত মানুষ ঘুমিয়ে গেল আমি ভগবানকে বললাম, 'তুমি এ ধরনের একটা হত্যাকে যদি হজম করে নিতে না পার তাহলে তুমি কিসের ভগবান ?'

'তাহলে আমি কি ?' ভগবান বলল।

আমি বললাম, 'তুমি কি সে কথা আমি বলতে পারি না, তবে এই হত্যা যজ্ঞকে সামনে রেখে তুমিই বলো, তুমি আসলে কি ?'

ভগবান মুহূর্তে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমি যে আসলে কি তা আমি নিজেও জানি না। কতকাল গত হলো—আমি ছিলাম আগুন—বন-বনান্তর আর লোকালয় পুড়ে ছারখার করে দিয়েছি। বন্য মানুষেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আমাকেই তখন ভগবান মনে করে পূজা করতে লাগলো। আমি পানি ছিলাম—তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের সে তাণ্ডব দেখে লোকেরা ভয়ে পিছিয়ে গেল। আমি সূর্য ছিলাম—আমার খর তাপে, কিরণের সম্পাতে আমি মেঘমল্লারকে খণ্ড-বিখণ্ড করে বেরিয়ে এসে সোনালী আলোর বন্যায় সারা চরাচরকে উদ্ভাসিত করেছি। আমি ছিলাম ধূ-ধূ প্রান্তর, বিশালকায় বৃক্ষ, বৃহদাকার ফণাধর সাপ—এমনি আমার কত কত নাম—কত কত রূপ—কত কত মণ্ডপ আমাকে ঘিরে—এভাবে মানুষের প্রতিটি চরিত্রের প্রতিফলন আমাকে নিয়ে। এরপর কালক্রমে মানব সমাজ ভয়কে জয় করে নিলো আর আমি আসন পেলাম অনেক শীর্ষে—আমি সহসা বিশালকায় বৃক্ষ, সমুদ্রের তাণ্ডব আর সূর্য থেকে বেরিয়ে এলাম এবং নিঃসীম শূন্যে পাড়ি দিলাম—আমার তখন কোন আকৃতি ছিল না—নিরাকার ছিলাম—আমি এক, অভিন্ন—আকাশ পাতালের অনেক ঊর্ধ্বে আমার মহা আসনে সমাসীন হলাম। আমার চারদিকে

বিশাল সৌর জগত পরিব্যাপ্ত—কোটি কোটি চন্দ্র তারকা সূর্য আর বিষুব রেখার মণ্ডল পরিক্রম করে বিস্ময় প্রকাশ করছে যে আসলে আমি কি ?

সহসা আমি মানুষের হাতের ছোট একটা বলের মতো বস্তু শূন্যে ছুঁড়ে দিলাম। সে বলটি নৃত্য করতে করতে আকাশ পাতাল সূর্য ও সৌর পরিক্রমাকে প্রকম্পিত করে আমার সিংহাসনের কাছে এসে লেগে গেল এবং আমার আসন টালমাটাল হয়ে উঠল, আর আমি তন্ময় হয়ে ভাবছিলাম আসলে আমি কি ?'

আমি বললাম, 'তাহলে শেষাবধি কি ঠিক করলে যে, তুমি আসলে কি ? দাদর পুলের উপকণ্ঠের একটি অন্ধকার ঝুপড়ির মধ্যে এই ক্ষুধার্ত মানুষটির কাছে তোমার আসল পরিচয় ফাঁস করতে হবে। আজ হত্যাকারী এবং হন্তা—দু'জনের চেহারাই তোমার সামনে রয়েছে। একটি শবদেহের চাইতে রহস্যজনক বস্তু এ ধরাধামে কিছু নেই। এই নিষ্পাপ শবদেহের উপর হাত রেখে দিব্যি করে বলো, 'তুমি কে ? তুমি কে ? সকল চিন্তা ও গবেষণার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে তুমি আসলে কে ?'

ভগবান এত কিছু শোনার পর শেষে আস্তে করে বলল, 'আসলে আমি মানুষ।'

কথাটা একটা বিস্ফোরণের মত শোনালো। এবং অখণ্ড নীরবতার মাঝে কানের মধ্যে গুঞ্জন করে বেড়াতে লাগলো। অন্ধকারের মাঝে ঝিল্লিরব আর এ কথার অনুরণই ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমি ভাবতে লাগলাম, সত্যি, ভগবান মানুষ ? মানুষ, অর্থাৎ হত্যাকারী এবং হন্তা দু'জনই ? ভোমরা এবং ফুল ? বার্ধক্য এবং যৌবন ? জীবন এবং মৃত্যু ? অনুরাগ এবং বিরাগ ? ঘৃণা এবং মিলন ? সভ্যতা এবং বর্বরতা ? ফেরেশতা এবং শয়তান ?

মানুষ। অর্থাৎ কিনা, মানুষ যতটুকু উন্নত ততটুকু, মানুষ যতটুকু নীচ ততটুকু নীচ···এ সবই কি সত্যি ? এটা কি সত্যি যে, ভগবান

মানুষকে তার প্রতিবিম্ব হিসেবে সৃষ্টি করেছে এবং মানুষও তাদের দর্পণে ভগবানকে দেখেছে। মানুষ শুধু মানুষ। যেদিন এ ধরা থেকে মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে···সেদিন কি ভগবানও মরে যাবে? তখন কি প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্য কিছুই থাকবে না?

উনিশ

দ্বিতীয় দিন ভগবান বলল, 'আমি কালই স্বর্গে চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে এরোড্রামে পৌঁছে দিয়ে আসো।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'তুমি প্লেনে চড়ে স্বর্গে যাবে?'

ভগবান বলল, 'না, প্লেন যখন চলতে শুরু করবে, আমি প্লেনের প্রপেলারে চেপে বসব—এভাবে প্লেন যখন নিঃসীম শূন্যে উঠে যাবে, সেখান থেকে উপরে উঠে যেতে আমার আর তেমন অসুবিধে হবে না। কারণ এক্সচেঞ্জের ঝামেলা তো শুধু এই মর্তের মাটির লোকদের জন্যে।'

আমি বললাম, 'তাহলে কখন রওনা দিতে চাও?'

'সন্ধ্যার দিকে রওনা দেব, ততক্ষণে তুমি আমাকে আরো কিছু ছেলে-পিলে দেখাও।'

আমি বললাম, 'ছেলেদের দেখার সাধ এখনো তোমার মিটলো না?'

'না, অদ্যাবধি আমি সেই ছেলেকে দেখিনি, যাকে আমি সত্যি দেখতে এসেছিলাম। আজ শেষ দিন, আজ হয়ত তার দেখা পেয়ে যাবো।'

আমি বললাম, 'তোমার সেই ছেলে সম্ভবত বোম্বেতে নেই।'

'তাহলে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'কোথায় পাওয়া যাবে তা আমি কেমন করে বলব? তুমিই বা

কি ধরনের ভগবান! তুমি যে ধরনের পূত-পবিত্র ছবি কল্পনা করে এসেছ, তা যদি আমাদের সমাজে না থাকে তাহলে তুমি কোথায় পাবে তাকে?'

ভগবান বলল, 'তোমাদের সমাজে নিষ্পাপ পবিত্র জীব তো শিশুরাই,—শিশুরাই তোমাদের সমাজের আসল পুঁজি। কিন্তু তোমরা তা কাজে লাগাতে পারলে কৈ?'

আমি বললাম, 'পুঁজি তো সুদের ওপর লগ্নি করে এবং মুনাফা অর্জন করে। অতএব আমরাও যদি মুনাফার জন্যে কোমলমতি শিশুদের কাজে খাটাই, তাতে তোমার এত বিস্ময়ের উদ্রেক হয় কেন? তুমি বাবা, স্বর্গে যেতে চাও, চলে যাও—আসলে সে ধরনের কোন কোমলমতি ছেলে এই শহরে পাবে না।'

ভগবান বলল, পাবো, 'পাবো, আজ সন্ধ্যা অবধি খুঁজলে অবশ্যি পাওয়া যাবে।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'চলো, এবার ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ো। আসলে গোড়াতেই আমাদের একটা ভুল হয়ে গেছে—তা হলো আমরা বড় আকারের ছেলের রূপ পরিগ্রহ করে ভুল করেছি। এবার আমরা দু'বছরের বেশী বড় মোটেই হবো না।'

আমি বললাম, 'সবই তোমার ইচ্ছে। তোমার ইচ্ছে হলে স্তন্য-পায়ী ছোট শিশুর রূপ ধারণ করতেও ক্ষতি নেই। তবে কিনা, আমার এতো ছোট শিশু হতে ভালো লাগে না। এতো ছোট হলে শেষে পায়ে হেঁটে এই ঝুপড়ি পর্যন্ত আসার উপায় থাকবে না।'

ভগবান বলল, 'তাহলে তুমি হও আট বছরের আর আমি হই ছ'বছরের।'

সারাদিন আমরা বোম্বের অলিগলি রাজপথ ঘুরে বেড়ালাম। যত নোংরা ঘিঞ্জি গলি, বস্তি, এখানে সেখানে বহু খোঁজাখুঁজি করলাম—কিন্তু সে ধরনের কোন শিশুর দেখা পেলাম না। শেষাবধি সূর্য যখন প্রায় অস্তাচলে ঢলে পড়েছে, দু'জনই ক্ষুধা-পিপাসায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এমন সময়

বুড়িবন্দর ডক্‌ইয়ার্ডের কাছাকাছি বছর সাতেক বয়সের একটা খোঁড়া ছেলের দেখা পেলাম। ময়লা দুর্গন্ধ ছিন্নবসন পরিহিত ছেলেটির হাতে কতগুলো পয়সা। সে পয়সা গুণতে গুণতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তার চোখে-মুখে একটা অপূর্ব প্রশান্তি। নিরুদ্বিগ্ন হাসি-খুশি এমন একটা মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না।

ভগবান তাকে দেখেই চমকে উঠলো। রীতিমতো একটা লাফ মেরে তার কাছে যেয়ে উপস্থিত হলো এবং বলল, 'তোমার নাম?'

'ভিকু।'

'কি কাজ কর?'

'ভিক্ষা করে খাই।'

ভগবান বলল, 'লজ্জা করে না ভিক্ষা করতে?'

'লজ্জা, কিসের লজ্জা? এই দেখো···পয়সা, শুধু পয়সা আর পয়সা।' বলেই খোঁড়া ছেলেটি দু'হাত নেড়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলো।

ভগবান তার ভাবসাব দেখে দু'পা পিছু হটে গেল এবং নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'তোমরা ক' ভাই-বোন?'

'বিশ জন।'

'বলছ কি, বিশ জন? সবাই কি তোমার সহোদর?'

'সহোদরই বলতে পারো। আমরা এক টুলিতে বিশ জন একত্রে থাকি।'

'তোমাদের বাবা-মার কাছে নিশ্চয়ই?'

'না, আমাদের দাদার কাছে। সে আমাদের খুব ভালবাসে। দু'বেলা খাবার, কাপড়-চোপড়—থাকার জন্যে জায়গা সবই তার কৃপায়। জানো, আমরা মাঝে মধ্যে সিনেমা দেখি, দাদার কাছে আমরা বেশ আছি।'

ভগবান আমার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর খোঁড়া ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাদের টুলিতে আমাদের দু'জনকে থাকতে দেবে?'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তুমি ভিক্ষুকদের টুলিতে থাকতে চাও?'

ভগবান বলল, 'তাতে হয়েছে কি? আমি এমন প্রশান্ত-চিত্ত সুবোধ বালকের দেখা আর পাইনি। আমার তো মনে হয় বিশটি ছেলেই ওর মতো সাদাসিদে। আমি অবশ্যই ওদের দলে যাবো।'

ছেলেটি বলল, 'দাদা তোমাদের জায়গা দেবেন কিনা এখন থেকেই বলা যায় না। তবে আমি তোমাদের নিয়ে যেতে পারি এক শর্তে, দাদা কিন্তু ভীষণ কড়া লোক, তার সব কথায় হ্যাঁ বলতে হবে।'

ভগবান সম্মতি জানিয়ে বলল, 'কোন অসুবিধে হবে না।'

আমি ভগবানকে আলাদা ডেকে নিয়ে নানা কথা বলে বাধা দিলাম। কিন্তু সে মানলো না, বাধ্য হয়ে দু'জনে খোঁড়া ছেলেটির পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। ছেলেটির পেছনে আমরা বহু অলি-গলি অতিক্রম করলাম। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। চার-দিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লো। অবশেষে সে আমাদের একটা পচা এঁদো ডোবার পাশের সারি সারি কতগুলো অন্ধকার ঘরের কাছে নিয়ে এলো। বিষাক্ত বাতাস আর ধোঁয়ায় চারদিকে দম আটকে যাবার মতো পরিবেশ।

খোঁড়া ছেলেটি আমাদেরকে একটা ঝুপড়ি ধরনের আস্তানার বিপরীত দিকের একটা স্বল্প পরিসর আঙ্গিনায় এনে দাঁড় করালো। আঙ্গিনার চারদিকে দলে দলে খোঁড়া, কানা, হাত নেই, পা নেই ইত্যাদি ধরনের বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের দল। সবাই মিলে মোটা-তাজা দশা-সই ধরনের একটি লোককে সারাদিনের হিসেব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল এ লোকটিই সকলের দাদা। তার পাশে দু'জন গাট্টা গোট্টা ধরনের জোয়ান দাঁড়িয়ে কটমট করে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে আছে।

সহসা দাদা একটি বিকলাঙ্গ মেয়েকে চড় মেরে বলল, 'আজ দেখছি দশ পয়সা কম এনেছিস।'

মেয়েটি চড় খেয়ে বেসামাল হয়ে অন্য একটি ছেলের গায়ে যেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ছেলে-মেয়ে দুটোই কান্না জুড়ে দিলো।

দাদা আবার হাঁক দিল, 'বের কর বাকী দশ পয়সা।'

মেয়েটি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমার কাছে নেই।'

দাদা তার দেহরক্ষীদের একজনকে ইশারা করতেই সে মেয়েটিকে বেদম মারতে মারতে দশ পয়সা বের করে নিলো। পয়সাটি সে গলার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল।

এরপর দ্বিতীয় একটি ছেলের পালা। সে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এলো। এই আঙ্গিনার অদূরে কতগুলো খড়কুটো জ্বেলে ক'জন বয়স্ক ভিক্ষুক আগুন পোহাচ্ছিল। এদিকের মার-ধোর সম্পর্কে তারা নির্বিকার। আপন মনে তারা আগুনের তাপ গ্রহণ করছিল।

এরপর ভিকুর পালা এলো। দুরু দুরু বুকে সে এগিয়ে এলো। দাদা ভিকুর আজকের উপার্জন দেখে খুশি হলো, বলল, 'সাবাস! আগামী দু'দিন যদি এরকম আনতে পারো, পরশু সিনেমা দেখাব।'

ভিকু বলল, 'দাদা, আজ আমার দু'জন বন্ধু নিয়ে এসেছি। আমাদের খাতায় নাম লেখাতে চায়।'

বলেই ভিকু আমাদের দু'জনের হাত ধরে দাদার সামনে এনে হাজির করলো। দাদা চোখ ছানাবড়া করে আমাদের আপাদমস্তক দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোদের মা-বাপ কোথায়?'

আমি আস্তে করে বললাম, 'মারা গেছে।'

আমাদেরকে টুলিতে ভর্তি করে নেয়া হলো। যথারীতি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাতে ভিকু এসে আমাদের গা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওঠো, দাদা তোমাদের ডাকছে।'

আমি বললাম, 'এত রাতে কেন ডাকছে?'

'তোমাদের নাম খাতায় তুলবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা কেমন করে?'

ভিকু বলল, 'তোমার পা ভেঙ্গে আমার মতো করে দেবে। আর দাদা (ভগবানের দিকে ইঙ্গিত করে) বলছিল—এই ছেলেটির চেহারা খুবই মায়াবী। পথচারীদের দেখে দয়া হবে। ওর চোখ আন্ধা করে দিলে সবচেয়ে ভালো

হবে।'

শুনে আমি চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। চীৎকার করে বললাম, 'সত্যি বলছ, আমার পা ভেঙ্গে দেবে?'

ভগবানও কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমার চোখ নষ্ট করে দেবে কেন?'

ভিকু বলল, 'বোঝ না কেন? সুস্থ সবল শিশুদের কেউ ভিক্ষা দেয় না। এ ধরনের ছেলেদের প্রতি কারো দয়া হয় না। যার চোখ নেই বা হাত নেই, পা নেই—এ ধরনের ছেলেদের সবাই ভিক্ষে দিয়ে থাকে। তোমার পা এবং ওর চোখ নষ্ট করে তোমাদের ভর্তি করিয়ে নেয়া হবে।'

সব শুনে আমরা পালিয়ে বাঁচার চিন্তা করলাম। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা যখন প্রাণপণে দৌড়াচ্ছিলাম, চারদিকে হৈ-হৈ রৈ-রৈ পড়ে গেল। রাতের অন্ধকারে 'ধরো ধরো, পালিয়ে গেল' ইত্যাদি ধ্বনি শুনে আমাদের হৃদস্পন্দন আরো বেড়ে গেল।

আমি পড়ি মরি করে পালিয়ে বাঁচতে সমর্থ হলাম। কিন্তু ভগবান পালাতে পারলো না, ভগবান ধরা পড়ে গেল।

পাশের একটা ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে গিয়ে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি ভগবানের পরিণাম দেখার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলাম।

ভগবান আসন্ন যন্ত্রণার ভয়ে চীৎকার করছিল। দুটো গাট্টা-গোট্টা গুণ্ডা ভগবানকে কষে ধরে রেখেছিল। আস্তে আস্তে ভগবানকে দাদার কাছে নিয়ে যাচ্ছে। দাদা একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে ছিল। আগুনে একটা লৌহ শলাকা দগ্ধ হচ্ছিল। গুণ্ডা দুটো ভগবানকে জবরদস্তি টেনে এনে দাদার সামনে শুইয়ে দিল। তারা দু'জনে ভগবানের হাত এবং পা চেপে ধরল শক্তভাবে। দাদা এক সময় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। তারপর গনগনে আগুনের লাল লৌহ শলাকাটি বের করে নিল আস্তে আস্তে।

সহসা একটা প্রচণ্ড চীৎকারে আকাশ-বাতাস যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি চোখ দুটো বন্ধ করে নিলাম। একটা তীব্র যন্ত্রণাবিদ্ধ আর্তনাদ থেকে

আমি যেন একটা কথা শুনতে পেলাম.....

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি,.....আমি দেখেছি।'

লোকেরা বলাবলি করছিল, এ সবই মিথ্যে। না ভগবান কোন-দিন আমার কাছে এসেছিল, না আমি তাকে কোনদিন দেখেছি। বোম্বের অলি-গলিতে আমাকে নিয়ে যে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে ভগবান নয়। এ সবই আজগুবী বানোয়াট কাহিনী। আমার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা মাত্র।

অবশ্য জবাবে আমি কোনকিছু হলফ করে বলতে পারিনে। তবে এটুকু আমি আপনাদের খেদমতে নিবেদন করে বলতে পারি, আসলে আমি ভগবানকে দেখেছি। সত্যিই দেখেছি, সম্ভবতঃ আপনিও তাকে দেখে থাকবেন, কিন্তু চিনতে পারেননি।

আমি যখন ভগবানকে প্রথমবার দেখি, তখন সে ছিল মাত্র দু'বছর বয়সের একটি অবলা শিশু। তার চোখ দুটো ছিল অন্ধ। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় সে দাদর পুলে দাঁড়িয়ে দু'হাত মেলে কান্না গদগদ কণ্ঠে পথ-চারীদের কাছে ভিক্ষা চাইছিল।

—সমাপ্ত—